স্বামী বিবেকানন্দের পরিব্রাজক

শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম. এ.
অধ্যাপক : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য
মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ, কলিকাতা

এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং
১১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

SWAMI VIVEKANANDER PARIBRAJAK

by

Prof. Arunkumar Chattopadhyay

প্রকাশক ঃ

এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং

১/১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ ঃ

চৈত্র, ১৩৪৮

প্রচ্ছদলিপি ঃ

শ্রীসুশীল নাগ

মুদ্রাকর ঃ

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেস

৪১/১, হিদারাম ব্যানার্জী লেন,

কলিকাতা-১২

স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর উদ্দেশে

বিষয়-পরিচয় ঃ

মুখবন্ধ

'স্বামী বিবেকানন্দের পরিব্রাজক' বইটিতে শ্রীচট্টোপাধ্যায় 'পরিব্রাজক' বইটিকে কেন্দ্র ক'রে বিবেকানন্দের সমকালীন মানসিকতা, তাঁর সাহিত্যধারার পরিচয় ও গদ্যশিল্প, তাঁর মুক্তবুদ্ধি ও প্রকৃতি-সৌন্দর্য-বোধ, তাঁর দেশ-দেশান্তর-বোধ ও কালচেতনার বিচার-বিশ্লেষণে নেমেছেন। সমালোচনার ক্ষেত্রে এই তাঁর প্রথম চেষ্টা। কিন্তু তথ্যনিষ্ঠা ও বিশ্লেষণীশক্তির জোরে তিনি প্রথম চেষ্টার দ্বিধা কাটিয়ে বহুক্ষেত্রেই নতুনভাবে ভাববার চেষ্টা করেছেন এবং প্রকাশনৈপুণ্যে তাঁর আলোচনাকে নাটকীয় বেগ দিতে পেরেছেন—এইটাই পাঠক সানন্দে লক্ষ্য করবেন।

প্রবল ব্যক্তিত্বের বলে প্রতিভা মূলতঃ সাহিত্যিক না হয়েও কোনো কোনো সময়ে সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা আনতে পারে, প্রবল আন্তরিকতায় তিনি ভাষায় স্বকীয় স্টাইল আনতে পারেন, দেশ-বিদেশের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার নির্ভীক বিচার করতে পারেন, একটা বিরাট মানসিকতা ও গভীর রসিকতার খনিও হয়ে উঠতে পারেন। এবং, দেশ-দেশান্তরের সংস্কৃতির তুলনামূলক বিচারে একটা আন্তর্জাতিক মানসিকতার পরিচয়ও তিনি দিতে পারেন—বিবেকানন্দের জীবন ও রচনা তাই প্রমাণ করে।

শ্রীচট্টোপাধ্যায় 'পরিব্রাজক'কে কেন্দ্র করে বিবেকানন্দের এই ব্যক্তিত্বের পরিচয়কে নির্দ্বিধায় প্রকাশ করতে পেরেছেন বলে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

নিবেদন

স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব মনীষা কর্মকৃতি ও সাহিত্য প্রভৃতি সম্পর্কে বহু বিদগ্ধ-পণ্ডিত, প্রাজ্ঞ-সমালোচক নানাভাবে আলোকপাত করেছেন ; কিন্তু তাঁর রচনাগুলির সামগ্রিক পর্যালোচনার অবকাশ এখনও যথেষ্ট পরিমাণে আছে বলে আমার বিশ্বাস। বাংলা সাম্মানিক পর্যায়ে 'পরিব্রাজক' গ্রন্থটি পড়াতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজন-মাফিক উক্ত গ্রন্থের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা গ্রন্থের সন্ধান দিতে অসমর্থ হয়েছি ; হয়তো তার জন্য আমার অজ্ঞতা ও সীমিত জ্ঞানই দায়ী। তবে পরামর্শ দিয়েছি ড. অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও সাহিত্যিক-সাংবাদিক শঙ্করের সম্পাদিত 'বিশ্ববিবেক', ড. প্রণবরঞ্জন ঘোষের 'বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য', ড. হরপ্রসাদ মিত্রের 'বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সমাজ-চিন্তা' এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি পড়বার। ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে বিবেকানন্দের অন্যান্য বাংলা মৌলিক রচনাগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনাসূত্রে কিছু বিস্তৃতভাবে 'পরিব্রাজক' গ্রন্থটি বিভিন্ন আলোকে দেখবার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি আমার এই আলোচনা গ্রন্থে। প্রাসঙ্গিক ভাবে জানাই যে, আমার আলোচনা গ্রন্থে স্থান ও ব্যক্তির নামের বানানের

ক্ষেত্রে মূল গ্রন্থকেই অনুসরণ করেছি। ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজন সিদ্ধ হলে আমার এই প্রচেষ্টা সার্থক জানব এবং কোন শিক্ষক গ্রন্থটি থেকে সামান্য মাত্র সাহায্য পেলে কৃতার্থ হব। এই প্রসঙ্গে জানাই যে, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থগুলি ও 'গদ্য-শিল্পী রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ থেকে আমি অল্প-বিস্তর সাহায্য নিয়েছি। আমার গ্রন্থের 'গদ্যশিল্পী বিবেকানন্দ' শীর্ষক অধ্যায়টি রচনায় ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিবেকানন্দ ও বাংলাগদ্য' প্রবন্ধটির সাহায্য নিয়েছি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ড. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার আমার গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়ে গ্রন্থের মর্যাদাবৃদ্ধি করেছেন। তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।

গ্রন্থটি রচনাকালে যাঁর অভিমতের দ্বারা আমার সিদ্ধান্তকে যাচাই করেছি তিনি আমার পিতৃদেব, আজীবন শিক্ষাব্রতী শ্রীবিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানানো নিতান্তই ধৃষ্টতা হবে।

এই সুযোগে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও আমার প্রাক্তন শিক্ষক ড. শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের উদ্দেশে, যিনি আমায় বাংলাভাষা ও সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার দিয়েছিলেন। যাঁদের উৎসাহ ও সস্নেহ উপদেশ এই রচনাকার্যে সর্বদা আমায় প্রেরণা দিয়েছে তাঁদের মধ্যে আমার অধ্যক্ষ ড. কিরণচন্দ্র চৌধুরী, বিভাগীয় প্রধান ড. পঞ্চানন চক্রবর্তী, অধ্যাপক শ্রীপাঁচুগোপাল দত্ত, অধ্যাপক শ্রীআদিত্য চৌধুরী, অধ্যাপক শ্রীশচীনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখের নাম বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। এঁদের প্রত্যেককেই জানাই আমার প্রণাম। গ্রন্থরচনায় আমার সংশয় দূর করার জন্য আমার অধ্যাপক ড. রবীন্দু গুপ্ত নানা ভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁর প্রতিও আমার প্রণাম জানাই। এঁরা ভিন্ন অধ্যাপক নলিনীকান্ত রায়, অধ্যাপক চন্দ্রনাথ রায়, অধ্যাপক কল্যাণ চৌধুরী, অধ্যাপক অসীম গুপ্ত, অধ্যাপক মণি রায়, বন্ধুবর

দেবশঙ্কর দাশ সর্বদা আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। আমার এই গ্রন্থ পরিকল্পনাকে স্বাগত জানিয়ে আমায় প্রেরণা দিয়েছেন অধ্যাপক সনৎ মিত্র (সনৎ দা') ও ড. সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় (সুভাষ দা')।

আমার সোদরপ্রতিম অগ্রজ শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে মুদ্রণকার্য পর্যন্ত প্রত্যেকটি স্তরে আমাকে সকল প্রকার সাহায্য করেছেন। তাঁর স্নেহ ও ভালবাসার কাছে আমি চিরঋণে আবদ্ধ হলাম। স্বল্প সময়ের মধ্যে অথচ সর্বাঙ্গসুন্দর-ভাবে গ্রন্থটির প্রকাশে সাহায্য করতে যখন কেউ রাজী হন নি, তখন সকল দুয়ার হতে ফিরে হাজির হলাম এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোম্পানির স্বত্বাধিকারী শ্রীঅনিলকুমার সরকার মহাশয়ের কাছে—দেখলাম তিনি যেন আমার জন্য অপেক্ষা করেই ছিলেন। আমার প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে গ্রন্থটির মুদ্রণ ও প্রকাশের যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিলেন। তাঁর প্রতি আমার অসীম কৃতজ্ঞতা জানাই। ধন্যবাদ জানাই শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেসের শ্রীতারকনাথ ঘোষ ও শ্রীদীলিপ ভট্টাচার্যকে—এঁদের সহযোগিতা ছাড়া এত দ্রুত গ্রন্থটি প্রকাশ করা সম্ভব হ'ত না। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রীভবরঞ্জন চাকলাদার ও শ্রীদীলিপ চট্টোপাধ্যায় প্রয়োজন মত বই সরবরাহ করে আমার রচনায় যথেষ্ট সাহায্য করেছেন—এঁদের দু'জনের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। মুদ্রণপ্রমাদ ও আমার অসতর্কতার জন্য যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে গেছে তা' আমার প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে ক্ষমার্হ হ'বে বলে আশা করি এবং শিক্ষকসমাজের কাছ থেকে সস্নেহ অভিমত পেলে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করব।

শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

১

॥ বিবেকানন্দ ও যুগমানস ॥

দেশ ও জাতির ক্ষেত্রে যখন আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব প্রাধান্য পায় তখন স্থিতিশীলতা বা গতিহীনতা তমসাবৃত করে তোলে নতুন জীবন-সূর্যের অভ্যুদয়কে, সংঘাত-সংঘর্ষ তথা আন্দোলন তখন অনিবার্য হয়ে ওঠে নব-সৃষ্টির সম্ভাবনাকে মূর্ত করে তুলতে। উনবিংশ শতাব্দী বিশেষ অর্থে এই সংঘাত ও সংঘর্ষের যুগ। বাঙলা দেশে বাঙালীর চিন্তা-চেতনায় তখন একদিকে যেমন ছিল আত্ম-সন্তুষ্টিবোধ এবং যার অনিবার্য পরিণাম ছিল গতিহীনতা, অপর দিকে তেমনি ক্ষীণকণ্ঠে ধ্বনিত হয় বাঁধন-ভাঙার জয়গান—তামসিকতার কারাগার থেকে প্রাণচঞ্চল জীবনবোধ ও আত্মপ্রত্যয়ে ভরপুর মনুষ্যত্বের মুক্তি ঘটান। এখন এই যুগমানসের বিশেষ স্বরূপটি বিচার্য।

বাঙালী-জীবনে সেই সময় ইংরেজের কেবল সাম্রাজ্যিক নয়, মানসিক বিজয়ও বিস্তার লাভ করেছিল। ইহভোগ-সর্বস্ব ইংরেজের শিক্ষা নব্য-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে মর্মান্তিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। পাশ্চাত্য হিউম্যানিজমের প্রভাবে উদারতন্ত্রী মানবিক আদর্শ অর্জন তখনও সম্ভব হয়নি অথচ জাতীয় জীবনের শ্রেয়-বোধের আদর্শও অবসিতপ্রায়। সনাতন হিন্দুধর্ম ও জীবনাচরণের প্রতি অবজ্ঞা এবং ইংরেজের নির্বিচার অনুকরণ সংস্কার-মুক্তির সোপান বলে শিক্ষিত বাঙালী সমাজের একটি বৃহত্তম অংশের কাছে বিশেষভাবে বিবেচিত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'বিলাতফের্তা' কবিতাতে এই মনোভাবটি বেশ স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে:

"আমরা বিলাতফের্তা ক' ভাই
আমরা সাহেব সেজেছি সবাই ;
তাই কি করি নাচার, স্বদেশী আচার
করিয়াছি সব জবাই ।"

এই নব্য যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা, চাল-চলন, আদব-কায়দা অনুকরণের সঙ্গে সঙ্গে মদ্যপান ও আনুষঙ্গিক নানাবিধ ভ্রষ্টাচারের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি পায়। পাশ্চাত্য বিদ্যা পরিপাক ও সংস্কারের শৃঙ্খল মোচনের জন্য ইঙ্গবঙ্গ আদব-কায়দার প্রকাশ ও সুরাপান ক্রমশঃই ব্যাপক আকার ধারণ করতে থাকে। রাজনারায়ণ বসুর স্বীকারোক্তিতে তৎকালীন নব্য যুবসম্প্রদায়ের মানসিক পট-চিত্র পাওয়া যায় ঃ

"...আমাদিগের বাসা তখন পটলডাঙ্গায় ছিল। আমি পাড়ার ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল (ইনি পরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া শান্তিপুরে অনেক দিন কার্য করিয়াছিলেন), প্রসন্নকুমার সেন এবং নন্দলাল মিত্র প্রভৃতির সহিত কলেজের গোলদিঘীতে মদ খাইতাম, এবং এখন যেখানে সেনেট হাউস হইয়াছে, সেখানে কতকগুলি শিক-কাবারের দোকান ছিল, তথা হইতে গোলদিঘীর রেল টপকাইয়া (ফটক দিয়া বাহির হইবার বিলম্ব সহিত না) উক্ত কাবাব কিনিয়া আনিয়া আমরা আহার করিতাম। আমি ও আমার সহচরেরা এইরূপ মাংস ও জলস্পর্শ শূন্য ব্রাণ্ডি খাওয়া সভ্যতা ও সমাজ সংস্কারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক কার্য মনে করিতাম।"[১]

বাঙলা দেশের আর একটি চিন্তাশীল শ্রেণী সেই সময়ে পাশ্চাত্য দেশীয় প্রত্যক্ষবাদ, যুক্তিবাদ ও জড়বাদের প্রভাবে সাম্য ও সমন্বয়ের আদর্শে বেসামাল হয়ে রামমোহন-প্রবর্তিত হিন্দুধর্মের বৈদান্তিক

---

১. রাজনারায়ণ বসু—আত্মচরিত ; পৃ. ৪১—৪২।

একেশ্বরবাদী ব্যাখ্যাকে পাশ কাটিয়ে ব্রাহ্মধর্ম নামে উপ-ধর্মের সৃষ্টি করেন এবং পারস্পরিক কলহে তার অবস্থান্তর ঘটাতে থাকেন। কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর সমর্থকরা ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 'ব্রাহ্মসমাজ' পরিত্যাগ করে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' গঠন করেন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মসমাজের নামান্তর ঘটে 'আদি ব্রাহ্মসমাজে' (১৮৬৮) পরিণত হয়। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র মাঘোৎসবে পঠিত অভিভাষণে সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শে 'নববিধান' নামে নবধর্ম প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন এবং তাঁর অনুগামীরা মতবিরোধের ফলে 'কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপনের কথা ঘোষণা করেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার ব্রাহ্মসভাগুলির এই ক্রমিক অবস্থান্তরের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেছেন :

> "ধর্মমতের স্বাধীনতার জন্য ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ, সামাজিক জগতে সাম্য প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হন কেশবচন্দ্র এবং সাধারণ লোকের সর্ব বিষয়ে তুল্য অধিকারের দাবির উপরপ্রতিষ্ঠিত হয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।"[১]

রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ তখন এই পরিবর্তনের মুখোমুখি না দাঁড়িয়ে মরুভূমিতে বালুঝঞ্ঝার মধ্যে উটের মতো বালিতে মুখ গুঁজে আত্ম-রক্ষার উপায় হিসাবে জীর্ণ সংস্কারগুলিকে আঁকড়ে ধরতে লাগল। এই সম্পর্কে বিবেকানন্দের অভিমতটি প্রণিধানযোগ্য :

> "বর্তমান ভারতে ধর্মের মূলতত্ত্ব অন্তর্হিত হইয়াছে, কেবল কতকগুলি বাহ্য অনুষ্ঠান পড়িয়া আছে। এখানকার লোক এখন হিন্দুও নহে বৈদান্তিকও নহে ; তাহারা ছুঁৎমার্গী। রান্নাঘর এখন তাহাদের মন্দির এবং হাঁড়ি দেবতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"[২]

---

১. রমেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলাদেশের ইতিহাস : আধুনিক যুগ ; পৃ. ১৯২।

২. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৫ম খণ্ড) : খেতড়িতে বক্তৃতা—বেদান্ত ; পৃ. ৩৪৭।

লোকাচার, দেশাচার এবং সংস্কারের দুর্বল শৃঙ্খল ধর্মের বেনামীতে অবরোধ সৃষ্টি করে পরিবর্তনের এই দুর্বার গতিপথকে রুদ্ধ করতে চাইল। পাশ্চাত্যের সকল কিছুর প্রতিই অশ্রদ্ধা এবং অবহেলা যেমন প্রকট হয়ে উঠল, তেমনি সমভাবে চলতে লাগল শ্রেণী-বিদ্বেষ এবং জাতিভেদের কঠোরতা পালন। ফলে পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রবল আঘাত হিন্দু ধর্ম ও সমাজের ভিত্তিভূমিকে যেমন বাইরে থেকে ক্রমশঃ ক্ষয় করতে লাগল, তেমনি অভ্যন্তরীণ বিভেদ ও বিদ্বেষ-প্রবণতা ভিতর থেকে আঘাত করে দেশকে দুর্বল করে তুলতে লাগল। সেই সময়ে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত মতাদর্শে বিশ্বাসী বাঙালীর চিন্তাচেতনার মধ্যে ঐক্য সংস্থাপিত না হওয়ায় রাষ্ট্রীয় বন্ধন-মুক্তির প্রচেষ্টার মধ্যেও সংহতির যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়; ফলে স্বাধীনতার স্বপ্ন ছিল দূরাগত। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ এই সুযোগে শোষণের জাল বিস্তৃত করে বাঙালী তথা ভারতবাসীকে অর্থনৈতিক দিক্ থেকে পঙ্গু করে ফেলেছিল। দারিদ্র্যপীড়িত এবং সংস্কার-বিজড়িত বাঙলা দেশে তখন কয়েকজন প্রবুদ্ধচিত্ত মনীষী মুক্তির তোরণ-দ্বার অন্বেষণ করছিলেন।

সাহিত্যে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু প্রমুখ, সমাজ ও শিক্ষা-সংস্কারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর এবং জ্ঞান-ভক্তি-যুক্তি ও স্বদেশ-হিতৈষণায় দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু, অক্ষয় দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণীয়। বিবেকানন্দের শৈশব, বাল্য, কৈশোর লালিত হয়েছে এই আবহাওয়ায়। ১৮৬৩-র ১২ই জানুআরি বিবেকানন্দ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের বত্রিশ বছর পূর্বে ইয়ং বেঙ্গলের প্রাণসঞ্চারক ডিরোজিও এবং তিরিশ বছর পূর্বে ভারত-পথিক রামমোহনের তিরোধান ঘটে। বিদ্যাসাগরের বয়স তখন একুশ বছর। পরধর্মের ভয়াবহতা থেকে আত্মরক্ষার অক্ষম প্রচেষ্টা ও স্বধর্মের নিধনযজ্ঞ থেকে দেশ ও জাতিকে যুক্তি, বুদ্ধি ও বিচারের আলোকে টেনে এনেছিলেন এঁরা। ভাবসর্বস্ব এই জীবন-

চেতনাকে কর্মব্রতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উনিশ শতকে আবির্ভূত হলেন চিত্তদুয়ার-মুক্ত সত্যান্বেষী বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ।

আত্মমুক্তিকামী সাধু-সন্ন্যাসীর দেশ ভারতবর্ষে এ এক নতুন সন্ন্যাসী—তিনি চান না নিজের মোক্ষ; চান ভারতবাসীর মোক্ষ, বিশ্ববাসীর মোক্ষ। গীতার কর্মযোগী কৃষ্ণের ধ্যানের সন্ন্যাসী তিনি—জ্ঞান-ভক্তিমিশ্র কর্মযোগের মূর্ত বিগ্রহ। তিনি সাধনপীঠে আসীন অচল ধ্যানী নন; সচল সন্ন্যাসী। আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়হীন এবং সংশয় ও সন্দেহে আন্দোলিত দেশবাসীকে আত্মস্থ হতে আহ্বান জানালেন। তাঁর আহ্বানের ভাষায় ছিল আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্‌গীরণের মতো উত্তাপ এবং কর্মে ছিল বিদ্যুৎ-প্রবাহের দ্রুততা। সুগভীর প্রজ্ঞা, শাণিত যুক্তি, স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা দেশবাসীকে সচকিত করে তুলেছিল। প্রথম যৌবনে যিনি লক, হিউম, হার্বাট স্পেন্‌সার প্রভৃতি পাশ্চাত্য মানবতাবাদী দার্শনিকের চিন্তাধারাকে পরিপাক করেছেন, তাঁর মধ্যে দেশের সনাতন ধর্মের এই যুক্তিনির্ভর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ লক্ষ্য করে নিতান্ত প্রগতিবাদীও শ্রদ্ধান্বিত না হয়ে পারলেন না। দেশের প্রগতিশীল অংশের পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ-স্পৃহা এবং রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের পাশ্চাত্যের প্রতি আকণ্ঠ বিদ্বেষ-বর্ষণকে তিনি প্রথমেই প্রশমিত করতে চাইলেন। এই উভয় শ্রেণীর দেশবাসীর বিচারবোধের এই অসম্পূর্ণতাকে 'বুদ্ধিহীন বহির্দৃষ্টি লোকের কথা' [১] বলে মন্তব্য করেন। দেশবাসীর এই বিচার-বিভ্রান্তি, সংশয়-সন্দেহ ও অহেতুক বিদ্বেষ-পরায়ণতা দূর করার জন্য বিবেকানন্দ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার পথ ধরলেন।

সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী ভারতবর্ষের অবর্ণনীয় দুর্দশা দেখে স্বামীজীর আবেগপ্রবণ অন্তর বিদীর্ণ হয়ে গেল। যে ভারত একদিন

---

১. স্বামী বিবেকানন্দ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য; পৃ. ৩।

ধনৈশ্বর্যে, কর্মে, বীর্যে ও আধ্যাত্মিক সম্পদে মহীয়ান্ ছিল সেই ভারতবর্ষের চিত্তদৈন্য কর্মবিমুখতা, আত্মপ্রত্যয়হীনতা, সংস্কারান্ধতা ও পরানুকরণ প্রবৃত্তি—এককথায় ঘোরতর তামসিকতা দেখে স্বামীজীর স্বদেশ-প্রেমিক চিত্ত হাহাকার করে উঠল। দেশের ভরসাস্থল নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের পরানুগত্য এবং অনুকরণ-স্পৃহাই স্বামীজীর কাছে সবচেয়ে দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশ্বাসহীন দেশবাসীকে বিবেকানন্দ আশার বাণী শুনিয়েছেন এবং স্বদেশ সম্পর্কে আত্মশ্লাঘাবোধ জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। স্বদেশ ও স্বসমাজের প্রতি শ্রদ্ধা ও গৌরববোধ অন্তরে জাগরিত না হলে পরাধীনতা-মুক্তি সম্ভব নয়—এই সত্যানুভূতি থেকেই তিনি স্বদেশ-প্রেমের ভাবমূর্তিকে প্রত্যক্ষ রূপমূর্তি দিয়েছেন তাঁর রচনায়ঃ

> "হে ভারত ;···ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই!...সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী ; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।"[১]

উনিশ শতকে বাঙালী মনীষীবৃন্দ কঠিন সাধনার দ্বারা ভারতবর্ষের ভাব-মূর্তিকে আয়ত্ত করতে ব্যস্ত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচক প্রমথনাথ বিশীর অভিমতটি উৎকলনযোগ্যঃ

> "এইসব ব্যক্তি বিন্দুতে-সিন্ধু পরিণত হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকে নিজেকে অণুভারতবর্ষরূপে দেখতেন, ভারতময়তা তাঁহাদের শুধু বুদ্ধির বস্তু নয় বিশ্বাসের বস্তু ছিল। তাঁহাদের সকলের প্রতিনিধিরূপে গৌরমোহন মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৮৫৭ সাল) জননী আনন্দময়ীর মধ্যে জননী ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ

১. স্বামী বিবেকানন্দ—বর্তমান ভারত ; পৃ. ২৪৯।

করিয়া বলিয়াছিলেন—'তুমিই আমার ভারতবর্ষ'। বঙ্কিমচন্দ্র আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়া গিয়া বলিলেন—'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী', দেশ ও দেবতা একীভূত হইয়া দেখা দিল। বিবেকানন্দ ভারতসত্তাকে জীবনসত্তার মধ্যে ছড়াইয়া দিয় সর্বব্যাপী করিয়া তুলিয়াছেন, বলিয়াছেন, 'শৈশবের শিশুশয্যা, যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী।' দেশকে ভৌগোলিক সত্তা ও রাজনৈতিক চিন্তা হইতে ঊর্ধ্বে টানিয়া তুলিয়া একটি বৃহৎ ব্যাপক দৃঢ়মূল সর্বজনীন বোধের উপরে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস এ যুগের সাধনা, রবীন্দ্রনাথের শিবাজীর উক্তি 'এক ধর্মরাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি—এই সাধনারা বাণীরূপ।"[২]

স্বদেশ সম্পর্কে বিবেকানন্দের এই উপলব্ধি কর্মব্রতের মধ্যে প্রতিষ্ঠা-অর্জনে সচেষ্ট হয়েছিল। জাতিভেদজনিত সামাজিক অসংহতি থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করা এবং সকল শ্রেণীর মানুষকে মনুষ্যত্বের মর্যাদায় অভিষিক্ত করে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে সমগ্র দেশবাসীকে আবদ্ধ করার উদার আহ্বানও ধ্বনিত হয়েছে। দেশ ও জাতির অগ্রগতির পথে আর একটি বাধাকে আশু অপসারণের তিনি পক্ষপাতি ছিলেন; সেটি হল দারিদ্র্য। অন্নহীন, বস্ত্রহীন মানুষকে ধর্ম দর্শন তত্ত্বকথা বুঝান বিড়ম্বনা মাত্র। ধর্মাচরণ যার জীবনে ব্রত সেই বিবেকানন্দ দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে ধর্মের শুষ্ক কৈতব কথায় মন ভোলানোর প্রচেষ্টাকে চরম ধিক্কার জানিয়েছেন। তাঁর মতে অভুক্ত মানুষের কাছে ধর্মের মুক্তি-মন্ত্র উপহাস স্বরূপ। ধর্ম তাঁর কাছে একটি বিশিষ্ট উপলব্ধি, সুস্থ-সবল জীবনাচরণের নির্দেশক। সুতরাং মানুষের প্রয়োজনকে বাদ দিয়ে ধর্ম অনুশীলন তাঁর কাছে অসম্ভব বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। বিবেকানন্দের ধর্মচেতনার বৈশিষ্ট্য হল বেদান্তবাদকে ঐহিক জীবনের সমৃদ্ধির সহায়ক করে

২. প্রমথনাথ বিশী—চিত্র-চরিত্র; পৃ. ১২

তোলা, জীব-সেবাই তাঁর কাছে ছিল শিবসেবার প্রতীক। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিবেকানন্দের মত সন্ন্যাসীর বিকল্প নেই।

॥ ২ ॥

বিবেকানন্দের আবির্ভাবের পশ্চাত-পট ও বিবেকানন্দের জীবন-দর্শনের মোটামুটি আভাস পাওয়া গেলেও বিবেকানন্দের মানস-গঠনে সমকালীন ধর্মচেতনা এবং তা' স্বীকরণের পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ, তাঁর প্রাথমিক পরিচয় ধর্মবেত্তা সন্ন্যাসী। চিরাচরিত ধর্মচিন্তা ও ধর্মাচরণ তাঁর উপলব্ধির বিশিষ্টতায় কি ভাবে রূপান্তরিত হয়েছে তা' জানতে গেলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর স্বরূপ-সন্ধান ও সমকালীন ধর্মান্দোলনের পর্যালোচনা প্রয়োজন।

রামমোহনের আবির্ভাবে হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণমুখী আলোচনার সূত্রপাত হয় এবং এই ধারা দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয় দত্ত পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে; এমন কি কেশব সেনের ধর্মাদর্শের প্রথম পর্ব ছিল জ্ঞান-মার্গী, পরবর্তীকালে ভক্তি-মার্গের আতিশয্য লক্ষ্য করা যায়। দেবেন্দ্রনাথও যুক্তিনিষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু রামমোহনের মত কঠোর যুক্তিবাদী নন। তাঁর জীবনে ভক্তির ঝোঁক ছিল বরাবরই। রামমোহনের ধর্মান্দোলনের মূলে ছিল হিন্দু ধর্মের বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাস ও তাদের প্রতিমা পূজা করার অসারতা প্রতিপন্ন করে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনাকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে স্বীকৃতি জানানো। এই উদ্দেশ্যে তিনি ঈশ, কেন, কঠ প্রভৃতি উপনিষদ প্রকাশ করা এবং বেদান্তের ভাষ্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। গ্রন্থ রচনা ছাড়া ব্রহ্ম সম্পর্কে আলোচনার জন্য ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করেন এবং অবশেষে 'ব্রহ্ম সভা' স্থাপন করেন। রামমোহনের মধ্যে বিশিষ্ট কোন ধর্মসম্প্রদায় সৃষ্টির অভিপ্রায় ছিল না। তাঁর এই সভায় হিন্দু,

মুসলমান খ্রীষ্টান নির্বিশেষে উপাসনায় যোগ দিত। নতুন ধর্ম-সম্প্রদায় সৃষ্টি করার অভিপ্রায় না থাকলেও তিনি প্রচলিত হিন্দু ধর্ম ও সংস্কারের প্রতি কঠোর আঘাত হেনেছিলেন। তিনি যুক্তিবাদ ও স্বাধীন ব্যক্তিচিন্তার আলোকে পৌত্তলিকতা বর্জন ও একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠায় সামাজিক অনুশাসন ও প্রচলিত শাস্ত্রবিধির বিরুদ্ধে অস্বীকৃতি জানানোর দৃপ্ত আহ্বান ধ্বনিত করেন। এই আহ্বানের প্রতিক্রিয়ায় হিন্দু সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি হল বটে, কিন্তু তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ব্রাহ্মসমাজ' উদার ধর্মমতের আদর্শ পরিত্যাগ করে একটি স্বতন্ত্র ধর্ম গঠনে তৎপর হয়ে উঠল।

রামমোহনের মৃত্যুর পর দ্বারকানাথ ঠাকুরের অর্থসাহায্যে এবং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের পরিচালনায় ব্রাহ্মসমাজ কোন রকমে আপন অস্তিত্ব রক্ষা করছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'তত্ত্ববোধিনী সভা' (১৮৩৯ খ্রীঃ) প্রতিষ্ঠা করে ব্রাহ্মসমাজ রক্ষা ও পরিচালনায় তৎপর হন। দেবেন্দ্রনাথের এই প্রচেষ্টায় সর্বাধিক সহযোগিতা করেন অক্ষয়কুমার দত্ত। এই সময় থেকেই রামমোহন-সৃষ্ট ব্রাহ্মসমাজ একটি বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে পরিণত হয়। কিন্তু তখনও হিন্দু সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়নি। দেবেন্দ্রনাথ পৌত্তলিকতা বর্জন করলেও প্রথম দিকে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সম্পর্কে কোন সংশয় প্রকাশ করেননি। কিন্তু ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে ক্রমশঃ এই বিশ্বাস শিথিল হতে থাকে এবং তিনি বেদ ও উপনিষদ থেকে আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ তত্ত্বসমূহ মাত্র সংকলন করেন। তিনি জানালেন:

> "ইহা কেহ মনে করিবেন না যে, আমাদের বেদ ও উপনিষদকে আমি একেবারে পরিত্যাগ করিলাম, ইহার সঙ্গে আমার আর কোন সংস্রব রহিল না। এই বেদ ও উপনিষদের যে সকল সার সত্য, তাহা লইয়াই ব্রাহ্ম ধর্ম সংগঠিত হইল......"[১]

দেবেন্দ্রনাথের এই উক্তিতে অন্ধ বিশ্বাস ও প্রচলিত সংস্কারের উর্ধ্বে

১. যোগেশচন্দ্র বাগল—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ; পৃ. ২৮।

যুক্তির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় এবং শাস্ত্রবাক্য অপেক্ষা আত্মপ্রত্যয় অধিকতর সিদ্ধ বলেই গৃহীত হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ অনুগত অক্ষয় দত্ত এই যুক্তিনিষ্ঠতার পথে আরও অধিক অগ্রসর হলেন। তিনি বিশ্বাস-মার্গীয় আপ্তবাক্যের ঘোরতর বিরোধী হয়ে উঠলেন। অক্ষয় দত্ত বেদ-বেদান্ত সম্বন্ধে যেমন সন্ধিহান ছিলেন, তেমনি ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা সম্বন্ধেও সংশয়ান্বিত হয়েছিলেন। তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গী বিজ্ঞানের যুক্তিসিদ্ধ পথেই জগৎব্যাপারে অগ্রসর হন, তবে ঈশ্বরবাদ ত্যাগ করেননি। অক্ষয়কুমার ব্রাহ্ম-সমাজ থেকে বেদ-বেদান্তের অপ্রতিহত প্রভাব তুলে দিয়ে বুদ্ধিবাদী জগৎচিন্তাকেই প্রাধান্য দেন।

তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের সম্বন্ধ ছিন্ন হওয়ার অল্প দিন পূর্বে কেশবচন্দ্র সেন দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগদান করেন। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজ পরিচালনার জন্য 'অধ্যক্ষসভা' (১৮৫৯. ২৫ ডিসেম্বর) গঠন করলে কেশবচন্দ্র এই সভার অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক মনোনীত হন। কেশবচন্দ্রের বাগ্মীতায় আকৃষ্ট হয়ে উমেশচন্দ্র দত্ত, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ যুবক এই সমাজে যোগদান করেন। দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের কর্মতৎপরতায় মুগ্ধ হন এবং তাঁকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধিতে ভূষিত করেন। 'কেশবচন্দ্রের এই সময় সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ স্মরণীয় ঘটনা। কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টাকে আরও অগ্রবর্তী করেন। তিনি কেবলমাত্র যুক্তি ও বিবেকের অনুশাসনকেই প্রাধান্য দেন—সেখানে যে কোন সামাজিকপ্রথা যুক্তি-বিরোধী হলেই তাকে বর্জন করার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করেন। জাতিভেদ-প্রথা উচ্ছেদ, বিধবা-বিবাহ অসবর্ণ বিবাহ স্ত্রীলোকের পর্দানসীনতা ও সমাজস্থ ব্রাহ্মণের উপবীত পরিত্যাগ প্রভৃতি সংস্কার কার্যে অগ্রণী হন। এই উগ্র সংস্কার-বিরোধী মনোভাবের জন্য

কেশবচন্দ্রের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে ওঠে। ১৮৬৬ সনে তাঁর উদ্যোগে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। সমগ্র ভারতবর্ষকে এক ধর্মপাশে আবদ্ধ করার আদর্শে এই সমাজ গঠন করেন এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন। ১৮৬০ সন থেকে তিনি জগতের বিভিন্ন স্থানের একেশ্বরবাদীদের সঙ্গে চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে থাকেন এবং এই সময়ে ভারতীয় খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক সূত্রে খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে অসাধারণ জ্ঞান ও যীশুর প্রতি অসীম ভক্তি-শ্রদ্ধার পরিচয় দেন। কেশবচন্দ্রের প্রচেষ্টায় ১৮৭২ সনে 'ব্রাহ্ম বিবাহ বিল' প্রভৃতি প্রণয়ন হওয়ায় ক্রমশ কেশবচন্দ্রের ধর্মসম্প্রদায় হিন্দুধর্মের গণ্ডির বাইরে চলে গেল। কিন্তু কেশবচন্দ্রের শেষ জীবনে তাঁর ধর্মচেতনার অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে এবং তাঁর অনুগামীদের মধ্যে ভাঙনের সৃষ্টি হয়। একদিকে খ্রীষ্টধর্মের আদর্শ 'ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব' প্রভৃতি আদর্শের প্রতি অনুরাগ, অপর দিকে বৈষ্ণবোচিত ভক্তিধর্মের আতিশয্য প্রাধান্য পায়। তাঁর অনুগামী ও তিনি নিজে ব্রাহ্ম সঙ্গীত ও সংকীর্তনাদির সময়ে ভক্তিভাবে বেসামাল হয়ে পড়তেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে ঘণ্টা বাজিয়ে কালী পূজা পর্যন্ত শুরু করেন। পরিশেষে ভগবানের প্রত্যাদেশ জ্ঞানে কুচবিহারের নিষ্ঠাবান্ হিন্দু রাজার সঙ্গে নিজ অপ্রাপ্ত বয়স্কা কন্যা সুনীতি দেবীর হিন্দু মতে শালগ্রাম শিলাকে সাক্ষী করে বিবাহ দিতে বাধ্য হন। ফলে তাঁর সমাজে ভাঙনের সৃষ্টি হয় এবং বিরুদ্ধবাদীরা 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ' গঠন করেন। কেশবচন্দ্র হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্ব, পৌত্তলিকতা, বৈষ্ণবের ভক্তিবাদ, শাক্তের শক্তিপূজা প্রভৃতির সঙ্গে ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মের আদর্শগুলির সমন্বয়সাধন করে 'নববিধান' নামে নতুন ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করেন।

এমন সময়ে আবির্ভূত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। পণ্ডিত নয়, মূর্খ পূজারী ব্রাহ্মণ—কিন্তু সকল জানার শেষ জানা হয়েছে

তাঁর। উপনিষদের সত্যের মূর্ত প্রকাশ ঘটেছে এই মূর্খ ব্রাহ্মণের মধ্যে—'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্' অর্থাৎ 'আমি সেই মহান্ পুরুষ ঈশ্বরকে জেনেছি'। বিচার নয়, সংশয় নয়—একেবারে প্রত্যক্ষ চাক্ষুস করা ব্যাপার। খ্রীষ্ট, কৃষ্ণ, চৈতন্য, বুদ্ধ সকলের প্রবর্তিত ধর্মমতের সাধনে সিদ্ধি অর্জন করে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলেন, 'সর্বধর্ম সত্য—যত মত তত পথ মাত্র'। ধর্মবিরোধ ও ধর্মগ্লানি নিবারণের জন্য গীতার কৃষ্ণ যেন যুগাবতারকে প্রেরণ করলেন। জ্ঞান-মূলক বেদান্তের সঙ্গে ভক্তি ও মূর্তি পূজার সমন্বয় ঠাকুরের জীবন ও ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের কোন সময়ে ভক্ত-পরিবৃত রামকৃষ্ণের কাছে বিবেকানন্দ উপস্থিত হয়ে ঠাকুরের মুখে জীবে দয়ার পরিবর্তে শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শ শুনে চমৎকৃত হলেন। গভীর পরিতৃপ্তি নিয়ে তিনি ফিরলেন :

> "যাহা হউক ভগবান যদি কখনও দিন দেন ত আজি যাহা শুনিলাম এই অদ্ভুত সত্য সংসারে সর্বত্র প্রচার করিব,—পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, সকলকে শুনাইয়া মোহিত করিব।"[২]

পরবর্তীকালে বিবেকানন্দ এই সত্যকেই সর্বত্র প্রচারের জন্য আত্ম-নিয়োগ করেন। ভগবৎ সাধনার উর্ধ্বে তাই মানব-হিতৈষণাকে জীবনের ব্রত হিসাবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন এবং সর্বাধিকভাবে স্বদেশ ও স্ব-সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও বিকাশের জন্য জাতির চারিত্রিক বলিষ্ঠতা ও মানসিক দৃঢ়তা সঞ্চার এবং দৃষ্টির সম্প্রসারণ ঘটানোর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর এই উপলব্ধির সরব ও সুস্পষ্ট প্রকাশ হল 'Man making is my mission'—'খাটি মানুষ তৈরি করাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য'। যে জ্ঞান আত্মমুক্তির সহায়ক যে ধর্ম শুষ্ক তর্ক মাত্র এবং

---

১. স্বামী সারদানন্দ—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—২য় খণ্ড ; পৃ. ৩৬৬।
২. ঐ — ঐ —৫ম খণ্ড ; পৃ. ২২৫।

সাধারণ মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য দূরীকরণে অসমর্থ, বিবেকানন্দ তাঁকে গ্রহণ করেননি। যে ধর্ম মানুষের ঐহিক জীবনের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করে, জীবনের সর্ববিধ প্রয়াসের মধ্যে সার্থক হয়ে ওঠে—যে ধর্ম-জ্ঞান চিত্তে পরদুঃখকাতরতা সঞ্চার করে কর্মে ও কথায় সেই দুঃখ থেকে উত্তরণের প্রেরণা দেয়, বিবেকানন্দ তাকেই জীবনে অনুসরণ করেছিলেন। আবার যে দেশ, যে জাতি ও যে কুলে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন—সেই দেশ ও জাতির সাধনা, সেই সমাজের ধর্মকে মালিন্য মুক্ত করে জগৎ-সভায় তুলে ধরার জন্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বর্তমানে স্বামীজীর মতো বিরল ব্যক্তিত্বের অনুপস্থিতি Milton-এর অভাবহেতু Wordsworth -এর খেদোক্তিকে স্মরণ করায়:

> Milton thou should'st be living at this hour
> England hath need of thee..." ১

১. **Wordsworth—London, 1802.**

২

বিবেকানন্দের সাহিত্য-সাধনার ধারায় পরিব্রাজক

বাংলা দেশের ইতিহাসে এমন কয়েকজন ভারতপথিক মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছিল যাঁরা জাতীয় জীবনকে সব দিক্ থেকে স্পন্দিত করেছিলেন, ইতিহাসের নব-অধ্যায়, সূচনা করেছিলেন। রামমোহন ও বিবেকানন্দ উনিশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও নবম দশকের এই দুই মনীষী এর উদাহরণ। এঁরা কেউই প্রচলিত অর্থে সাহিত্যিক ছিলেন না, কিন্তু প্রতিভার অলৌকিক স্পর্শেও স্বাজাত্য-বোধের প্রাবল্যে সরস লিপিকুশলতায় জাতির জড়ত্ব মোচন করে গেছেন। আপন ব্রতপালন উপলক্ষে অর্থাৎ শিক্ষা ও বাণী প্রচারে, জাতীয় চরিত্রোন্নতি বিধান ও সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনে এঁরা সাহিত্য-সাধনা করেছেন। সেই সাহিত্য যেমন বর্ণনা-কুশলতায় রসমাধুর্য অর্জন করেছে তেমনি অসাধারণ ভাবগাম্ভীর্য ব্যঞ্জনাশক্তি অর্থবহন ক্ষমতা ও তীব্র গতিশক্তি লাভ করেছে। বীরসন্ন্যাসী বিশুদ্ধ সারস্বত প্রেরণায় সরস্বতীর মানস সরোবরে অবগাহন করেননি, গভীর স্বদেশপ্রেম, স্বজাতি ও স্বধর্মপ্রীতিই তাকে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে অনুপ্রাণিত করেছে। সেইজন্য তাঁর রচনার ফাঁকে ফাঁকে রসো-ত্তীর্ণ সাহিত্যকর্মেব বহু সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কর্মবীর বিবেকানন্দের কর্মপ্রীতির দ্বারা তা'আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে; তথাপি তাঁর রচনাবলীতে সরস লিপিভঙ্গীর আশ্রয়ে যেরূপ দার্শনিক, সামাজিক ও ধর্মীয়তত্ত্বের সুনিপুণ ব্যাখ্যা করেছেন এবং গভীর দেশপ্রেমের পরিচয় রাখতে সমর্থ হয়েছেন তাই তাঁর রচনাবলীকে কালোত্তীর্ণ করেছে। সর্বোপরি তাঁর সাহিত্যে পরিস্ফুট হয়েছে গভীর আত্মপ্রত্যয়বোধ। এই প্রত্যয়নিষ্ঠ উপলব্ধি যেমন তাঁর কর্মানুসরণের প্রেরণা তেমনি

[ত]াঁর সাহিত্যকৃতিও সেই প্রত্যয়ে প্রোজ্জ্বল। যে কোন অসহায় [দু]র্বলচেতা মানুষের অন্তরে তা বলিষ্ঠতার সঞ্চার করে। দেশকালের [প]টভূমিকায় জাতীয়জীবনের অনিবার্য প্রয়োজনে বিবেকানন্দের [স]াহিত্যসাধনা—খ্যাতির প্রলোভন সেখানে নেই, আছে অবিচল [ক]র্তব্যনিষ্ঠার স্বাক্ষর। গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর গৃহবাসী মানুষের প্রতি [ঐ]কান্তিক মমত্ব বশতঃই লেখনী ধারণ করেন। বিশেষ অর্থে তাঁর [স]াহিত্য সাধনা কর্তব্যবোধের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত।

গৈরিকবসন সন্ন্যাসীর কর্তব্যকঠোর জীবনের অন্তরালে যে সৌন্দর্যমুগ্ধ কবিমন ছিল তা তাঁর রচনা পড়লেই উপলব্ধি করা যায়। উচ্চতর চিন্তা ও মনন-সমৃদ্ধ তত্ত্ব ও তথ্যের কঠিন পাষাণ-কারার অন্তরালে সৌন্দর্যমুগ্ধ কল্পনাপ্রবণ মন তরঙ্গিত হয়েছে নিত্য নূতন ভাবের আবেগে। জগৎ-রহস্য ও জীবন-রহস্যের বিচিত্র দিক্ আলোড়িত হয়েছে সেই তরঙ্গে। তার সন্ধান পাওয়া যায় কোথাও আত্মনিবিষ্ট ভাবানুভূতিরূপে, কোথাও জাগতিক পর্যবেক্ষণের উজ্জ্বল বর্ণাঢ্য চিত্রে, কোথাও রসার্দ্র জীবন-চিন্তার মনোরম আলেখ্যে। অথচ তারি মধ্যে যুক্ত হয়েছে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব। তাঁর মানস গঠনের মূল উপাদান ছিল লোককল্যাণ। সেই লোক-কল্যাণকর কর্ম ও আচরণকে যখন কথাবিস্তারের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করেছেন সেখানে তত্ত্ব ও তথ্যের অনিবার্য আমন্ত্রণ ঘটেছে বটে কিন্তু সরস পরিহাস-রসিকতা ও আবেগময়তাকে সন্ন্যাসের সংযম দিয়ে বাঁধতে চাননি। তাঁর রচনা জীবনাভিজ্ঞতার নির্যাস নিসিক্ত দার্শনিক চিন্তাসমৃদ্ধ এবং কখনো কখনোও নীতিকথায় পর্যবসিত হয়েছে কিন্তু সৌন্দর্যবোধ তার উপর এক আবরণ টেনে দিয়ে তত্ত্বকথার শুষ্কতা থেকে তাকে রক্ষা করেছে। বিশাল ব্যাপ্ত গিরিবক্ষ থেকে নির্গত তটিনীর কলহাস্য যেমন উত্তুঙ্গ পর্বতশৃঙ্গের গাম্ভীর্যকে তরল করে দেয় তেমনি বিবেকানন্দ সমুন্নত আদর্শ ও গাম্ভীর্যমণ্ডিত বক্তব্য পরিবেশনের মাঝে সরস কৌতুককর চটুল অথচ

তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যের আলোকসম্পাত ঘটিয়ে অসাধারণ পরিবেশন নৈপুণ্যের পরিচয় দেখিয়েছেন। তটিনীর কলহাস্যে পর্বতশৃঙ্গের গাম্ভীর্য তরল হলেও যেমন তার মহিমা ক্ষুণ্ণ হয় না তেমনি তাঁর পরিহাস-রসিকতা বক্তব্যের গাম্ভীর্যকে রক্ষা করেও পরিবেশন-রীতিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ফলে তাঁর বক্তব্য খুব সহজেই পাঠকের অন্তরকে স্পর্শ করে। কারণ 'humour is the best sauce of life' যদি হয় তবে সাহিত্যে সেই রসিকতা সঞ্চার করে দিলে জনচিত্তে তার আবেদন অনিবার্যভাবেই ঘটবে। প্রসঙ্গতঃ দুটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে একটি গভীর সামাজিক তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এক প্রচলিত পূর্ববঙ্গীয় উক্তির উদ্ধৃতি করেছেন; 'ব্যাতন না জানলে বোদ্র অবোদ্র বুঝবো ক্যামনে ?'[১] এবং অনুকরণপ্রিয় দাস-মনোবৃত্তিসম্পন্ন ভারতবাসী ইংরেজের কাছে কিরূপ অপমানিত ও লাঞ্ছিত হত তারই একটি হাস্যোজ্জ্বল অথচ করুণ কটাক্ষপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন; 'সাধ করে শিখেছিনু সাহেবানি কত, গোরার বুটের তলে সব হৈল হত'। এইরূপ হাস্যোজ্জ্বল অথচ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ একাধিক মন্তব্যের আলোক ফেলে তাঁর মননঋদ্ধ রচনাকে এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য দান করেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবৎকাল মাত্র উনচল্লিশ বৎসর এবং এই সংক্ষিপ্ত জীবনের আরও সংক্ষিপ্ততম সময় অর্থাৎ অল্পাধিক তিন বৎসরকাল লিখন-শিল্পে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর মৌলিক গদ্য রচনার বই চারটি,—'ভাববার কথা' (১৯০৭), 'বর্তমান ভারত' (১৯০৫), 'পরিব্রাজক' (১৯০৬), এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' (১৯০২)—'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম থেকেই (১৩০৫ সাল; ইং ১৮৯৯) পৃষ্ঠা পূরণের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হতে থাকে। 'উদ্বোধন'

১. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—'বেশভূষা' অধ্যায়; পৃ. ৬৭।
২. পরিব্রাজক; দশম সং; পৃ. ৩২।

পত্রিকায় রচনাগুলির আত্মপ্রকাশ ঘটলেও এই রচনাগুলির অধিকাংশ স্বামীজীর বিদেশযাত্রাপথে জাহাজে অথবা প্রবাসকালে লেখা। স্বামীজী দ্বিতীয়বার বিলেত যাত্রা করেন ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুন এবং ভ্রমণশেষে বেলুড়মঠে প্রত্যাবর্তন করেন ৯ই ডিসেম্বর, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। সন-তারিখ মিলিয়ে দেখা যায় যে, অন্তর্বর্তীকালীন এই ১৮ মাসে পথে ও প্রবাসে তিনি রচনা করেছেন 'বর্তমান ভারত', 'পরিব্রাজক' এবং 'ভাববার কথা'র কোন কোন প্রবন্ধ এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে মাত্র একটি বই লিখেছেন, সেটি হল 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'। কালানুক্রমিকভাবে এই রচনাগুলির প্রকাশকাল উল্লেখ করা যায় যে, 'পরিব্রাজক' গ্রন্থটি উদ্বোধন পত্রিকার প্রথম বছরে পঞ্চদশ সংখ্যা থেকে 'বিলাতযাত্রীর পত্র' নামে প্রকাশিত হয় ; পত্রিকার দ্বিতীয় বছরে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থ এবং 'বর্তমান ভারত' উদ্বোধন পত্রিকার প্রথম দু'বছরের পাক্ষিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বিবেকানন্দের বিবিধ বিষয়ের রচনার সংকলন 'ভাববার কথা।'

'ভাববার কথা'র প্রবন্ধ-সংখ্যা ন'টি। প্রথম প্রবন্ধ 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' এবং দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি'—প্রবন্ধ দুটির প্রথমটিতে বিবেকানন্দের ব্যক্তিগত উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে এবং দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে বেদবিদ্ জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্স্‌মুলারের রামকৃষ্ণের বাণী ও জীবনী সম্পর্কিত বইটি সম্পর্কে বিবেকানন্দের আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম প্রবন্ধটিতে বিবেকানন্দের অভিপ্রেত বক্তব্য হল, যুগ প্রয়োজনে ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার মর্ম-সত্যকে উদ্‌ঘাটন করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব :

> "......কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্মের সার্বলৌকিক, সার্বকালিক ও সার্বদৈশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া, লোকসমক্ষে সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণ স্বরূপ

আপনাকে প্রদর্শন করিতে লোকহিতের জন্য শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

ভারতবর্ষের ধর্ম সম্পর্কে ইউরোপবাসীদের ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের জন্য ভারতের ধর্ম ও আদর্শ-ধার্মিকের পরিচয় জ্ঞাপনার্থে ম্যাক্সমুলার 'প্রকৃত মহাত্মা' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন এবং তারই বর্ধিত সংস্করণ 'The life and sayings of Ramakrishna' নামে প্রবন্ধ। তৃতীয় প্রবন্ধ 'ঈশা অনুসরণ'; চতুর্থ প্রবন্ধ 'বর্তমান সমস্যা'। বর্তমান সমস্যা প্রবন্ধে উনিশ শতকের চিন্তাজগতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার যে সংঘাত সৃষ্টি হয় তারই সামঞ্জস্য নির্দেশিত হয়েছে পঞ্চম প্রবন্ধ 'বাঙ্গালা ভাষা'য় বিবেকানন্দের বাংলা গদ্য ভাষা সম্পর্কে আধুনিক চিন্তাধারার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ষষ্ঠ প্রবন্ধ 'জ্ঞানার্জন' এ আধুনিক প্রত্যক্ষবাদী জ্ঞান ও প্রাচীন অপ্রত্যক্ষবাদী জ্ঞানের তুলনামূলক আলোচনায় জ্ঞানের ন্যায্যতা স্বীকার করে কেবল তার তারতম্যের নির্দেশ করেছেন। সপ্তম প্রবন্ধটির নাম 'ভাববার কথা', এই রচনায় সকৌতুকভাবে ভক্তিমার্গে কয়েকটি আত্মপ্রবঞ্চনার বিবরণ দিয়েছেন। 'পারিপ্রদর্শনী' নামক অষ্টম প্রবন্ধে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে উক্ত নগরীতে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় বিবেকানন্দের বক্তৃতার স্বরচিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। নবম প্রবন্ধ 'শিবের ভূত' অসমাপ্ত রচনা, লেখাটি তাঁর চলিত গদ্যরীতির উদাহরণ।

'বর্তমান ভারতে'র ভূমিকায় সারদানন্দ জানিয়েছেন, বিবেকানন্দ উক্ত গ্রন্থে 'তমসাচ্ছন্ন ভারতেতিহাসে একটা পূর্বাপর সম্বন্ধ' পর্যালোচনার সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষার ক্রম প্রসারের ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সভ্যতাদর্শের যে পারস্পরিক সংঘাত সৃষ্টি হয়েছিল এবং এই উভয় সভ্যতার কোন্‌টি দেশ ও জাতির কাছে গ্রহণযোগ্য তারই একটি সমাধানমূলক দার্শনিক সিদ্ধান্ত বিবেকানন্দ এই গ্রন্থে নির্দেশ করেছেন। পাশ্চাত্যের মাত্রাতিরিক্ত বাস্তববাদী চিন্তা, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও রাষ্ট্রচেতনা প্রভৃতি

আদর্শ গ্রহণের প্রতি অত্যুগ্র আগ্রহ এবং আপন আদর্শের বিস্মরণের পরিণতি সম্পর্কে তিনি সাবধানবাণী নির্দেশ করেছেন। ভারতচিন্তার এ এক দার্শনিক প্রকাশ। তাই স্বামী সারদানন্দ গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন :

> "……ইহা একখানি দার্শনিক গ্রন্থ। ভারত সমাগত যাবতীয় জাতির মানসিক ভাবরাশি-সমুদ্ভূত দ্বন্দ্ব দশসহস্রবর্ষব্যাপী কাল ধরিয়া উহাদিগকে পরিচালিত এবং ধীরে ধীরে শ্রেণীবদ্ধ, উন্নত, অবনত ও অপরিবর্তিত করিয়া দেশে সুখ-দুঃখের পরিমাণ কিরূপে হ্রাস, কখন বা বৃদ্ধি করিয়াছে এবং বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ, বিভিন্ন আচার-ব্যবহার, কার্যপ্রণালীর মধ্যেও এই আপাত-অসম্বদ্ধ ভারতীয় জাতি-সমূহ কোন সূত্রেই বা আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া সমভাবে পরিচয় দিতেছে এবং কোন দিকেই বা ইহাদের ভবিষ্যৎ গতি, সেই গুরুতর দার্শনিক বিষয়ই 'বর্তমান ভারতে'র আলোচ্য বিষয়।"

বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে সমাগত বিভিন্ন জাতি, ভারতের বিভিন্ন যুগের ধর্মনীতি, সভ্যতা, সংস্কৃতি ভারতীয় হিন্দুত্বের বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা এবং পর্যায়ক্রমে চতুর্বর্ণের আধিপত্য বিস্তার প্রভৃতির বর্ণনা ও মননঋদ্ধ বিশ্লেষণে গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় যুগের অবসান, বর্তমান বিশ্বে বৈশ্যশক্তির প্রাধান্য এবং আগামী দিনে শূদ্র জাতির আপন ধর্ম-কর্ম ও বিশিষ্টতা নিয়ে আবির্ভাবের সংকেত তিনি জানিয়েছেন। 'বর্তমান ভারতে'র শেষ পরিচ্ছেদে বিবেকানন্দের ভারত-আত্মার স্বরূপ সাধনার উদাত্ত প্রকাশ ঘটেছে :

> "হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ, সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয় সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য

নহে ; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত ; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র ; ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই ; তুমিও কটি-মাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী ; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ ; আর বল দিনরাত্ত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও ; মা আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই শিরোনামটিই গ্রন্থবদ্ধ বিষয়বস্তুর স্পষ্ট নির্দেশক। সুগভীর প্রজ্ঞা ও শাণিত যুক্তির আলোকে তাঁর ভূয়োদর্শিতার বিশিষ্ট প্রকাশে গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে উভয় সভ্যতার সত্য স্বরূপ সন্ধান করে পারস্পরিক বিভেদ-প্রবণতা, বিদ্বেষ, সন্দেহ ও সংশয় দূর করার জন্য তিনি সচেষ্ট হয়েছেন। প্রথম পরিচয়সূত্রে ভারতবাসী ও ইংরেজের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর সংকীর্ণতাহেতু যে বিরূপতার সৃষ্টি হয়েছিল তাকে যুক্তিসিদ্ধ বিশ্লেষণের আলোকে প্রথম প্রশমিত করার চেষ্টা করেন, পরে উভয় সভ্যতার দোষ-ত্রুটি, ভাল-মন্দ পর্যালোচনা করে সমন্বয়ের সূত্র নির্দেশ করেন। উভয় জাতির পরিচয়ের প্রাথমিক রূপটি সম্পর্কে বলেছেন, ইংরেজের চক্ষে ভারতবাসী ছিল আধি-ব্যাধি ও অনাহারক্লিষ্ট এবং আশা-উদ্যম, আনন্দ ও উৎসাহবিহীন জাতি ; অপর দিকে ভারতবাসীর চক্ষে ইংরেজ পানোন্মত্ত ব্যাভিচারী হিতাহিতবোধহীন ও হিংস্র পশুবৎ এবং আচারহীন অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপনে অভ্যস্ত, পরদেশ ও পরধন

অপহরণের নির্লজ্জ প্রবৃত্তিসম্পন্ন জাতি। উভয় জাতির দৃষ্টিভঙ্গীর এই মূঢ়তাকে দূর করার জন্য তিনি সচেষ্ট হয়েছেন। পারস্পরিক এই বিরূপতা চরমভাবে প্রকাশিত হয়ে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কিভাবে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল তার স্বরূপ সম্পর্কে বলেছেন :

"বিদেশীকে আমরা সমাজে মিশতে দিই না, 'ম্লেচ্ছ' বলি,—ওরাও 'কালো দাস বলে' আমাদের ঘৃণা করে।"

ভারতবাসীর এক শ্রেণীর পরানুকরণের প্রতি অত্যুগ্র লিপ্সাকে বিবেকানন্দ ঘৃণা জানিয়ে বলেছেন :

"ঐ বুড়ো শিবের অন্ন খাবেন, আর নিমক হারামি করবেন, যীশুর জয় গাইবেন—আ মরি।" স্বদেশপ্রীতির প্রবক্তা স্বামীজী সংকীর্ণ স্বদেশ-চেতনার বিরোধিতা করে সমন্বয়ের উদার জগতিতলে স্বজাতির মুক্তির কথা ঘোষণা করেছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গ্রন্থের 'স্বধর্ম বা জাতিধর্ম' প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথের 'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে'ই বিবেকানন্দের কণ্ঠে বজ্রকঠোর গাম্ভীর্যের সঙ্গে ধ্বনিত হয় :

"যে মানুষটা বলে, আমার শেখবার নেই, সে মরতে বসেছে ; যে জাতটে বলে আমরা সবজান্তা, সে জাতির অবনতির দিন অতি নিকট। যত দিন বাঁচি ততদিন শিখি।"

কিন্তু বিবেকানন্দের এই সমন্বয়বাদী চিন্তা কখনই জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করতে শেখায়নি। স্বজাতি ও স্বদেশের অনুকূলে বিজাতীয় ভাবের সমীকরণ ঘটিয়ে তাকে গ্রহণ করার কথা বলেছেন—

"ঐ রকম বিদেশী যা কিছু শিখতে হবে, সেটা আমাদের মতো করে—পা গুটিয়ে আসল জাতীয় চরিত্রটি বজায় রেখে।"

॥ ২ ॥

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুন স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতা থেকে গোলকোণ্ডা জাহাজে দ্বিতীয় বার পাশ্চাত্য পরিভ্রমণে যান। সঙ্গী ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা। 'উদ্বোধন' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের অনুরোধে স্বামীজী নিয়মিত ভাবে তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠাতে সম্মত হন। পত্রাকারে লিখিত সেই নানা অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত উদ্বোধন পত্রিকার প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের বিভিন্ন সংখ্যায় 'বিলাতযাত্রীর পত্র' রূপে প্রকাশিত হয়। কয়েক বৎসর পরে স্বামী সারদানন্দের তত্ত্বাবধানে 'পরিব্রাজক' নামে সমগ্র রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই লেখায় বিবেকানন্দ 'তু—ভায়া' এই সম্বোধনবাচক শব্দটি সহযাত্রী স্বামী তুরীয়ানন্দের নাম-সংক্ষেপের জন্য এবং 'স্বামীজী' সম্বোধনটি স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে বোঝাবার জন্য ব্যবহার করেছেন।

'পরিব্রাজক' গ্রন্থে বিবেকানন্দের দ্বিতীয় বার বিদেশ ভ্রমণের বৃত্তান্ত বিবৃত হয়েছে। বিবেকানন্দ এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত 'উদ্বোধন' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের অনুরোধে পত্রাকারে সংকলন করেন এবং উক্ত পত্রিকার প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে 'বিলাতযাত্রীর পত্র' রূপে প্রকাশিত হয়। পথ ও প্রবাসের প্রাত্যহিক সংবাদ ব্যক্তিগত সংগ্রহভাণ্ডার ডায়েরিতে সঞ্চয় করার প্রস্তাবনা তাঁর মৌখিক স্বীকারোক্তিতেই পাওয়া যায়। উদ্বোধন পত্রিকায় প্রকাশিত বিলাতযাত্রীর পত্রই পরবর্তীকালে স্বামী সারদানন্দের তত্ত্বাবধানে 'পরিব্রাজক' এই শিরোনামে চিহ্নিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। সুতরাং ডায়েরি, পত্রসাহিত্য ও ভ্রমণ-কাহিনীর আলোকসম্পাত ঘটিয়ে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন

'পরিব্রাজক' কোন্ জাতীয় সাহিত্য। ডায়েরি আপন বক্ষে ব্যক্তির ভাবনাচিন্তা, কর্ম ও কথা, ত্রুটি-বিচ্যুতি, স্খলন-পতন, ভাল-মন্দ প্রভৃতি একান্ত আত্মগত বিষয় বহন করে। অনেকাংশে ডায়েরি ব্যক্তির একটি কৃত্রিম জীবন। জীবনের সমান্তরালে সন-তারিখ চিহ্নিত ডায়েরি আর একটি জীবন। স্থান, কাল, পাত্র ও পরিবেশভেদে ব্যক্তির চিন্তা ও আচরণের বহু অসঙ্গতি থাকে, কিন্তু সমগ্র ব্যক্তিটি ধরা পড়ে ডায়েরির কারাগারে। ডায়েরি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমতটি প্রণিধানযোগ্য :

"ভিতরে একটা লোক প্রতিদিন সংসারের উপর নানা চিন্তা, নানা কাজ গাঁথিয়া গাঁথিয়া এক অনাবিষ্কৃত নিয়মে একটি জীবন গড়িয়া চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ডায়ারি লিখিয়া গেলে তাহাকে ভাঙিয়া আর একটি লোক গড়িয়া আর একটি দ্বিতীয় জীবন খাড়া করা হয়।...জীবনের গতি স্বভাবতঃই রহস্যময়, তাহার মধ্যে অনেক আত্মখণ্ডন, অনেক স্বতোবিরোধ, অনেক পূর্বাপরের অসামঞ্জস্য থাকে। কিন্তু লেখনী স্বভাবতঃই একটা সুনির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিতে চাহে। সে সমস্ত বিরোধের মীমাংসা করিয়া সমস্ত অসামঞ্জস্য সমান করিয়া, কেবল একটা মোটামুটি রেখা টানিতে পারে। সে একটা ঘটনা দেখিলে তাহার যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে উপস্থিত না হইয়া থাকিতে পারে না। কাজেই তাহার রেখাটা সহজেই তাহার নিজের গড়া সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, এবং জীবনকেও তাহার সহিত মিলাইয়া আপনার অনুবর্তী করিতে চাহে।"[১]

সুতরাং এই অভিমতের অনুসরণে বলা যায় যে, ডায়েরি আত্মকথনের অবকাশে অনিবার্য ভাবেই কিছু কল্পনার সুযোগ নেয়। ফলে, জীবন যা আছে তার বিবৃতি ছাড়াও যা হওয়া উচিত ছিল তাকেও তার সঙ্গে যুক্ত করে দেয়।

---

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—পঞ্চভূত ; 'পরিচয়' অংশ ; পৃ. ৬-৭

পত্রসাহিত্য আধুনিক শিল্পরীতির একটি বিশিষ্ট দিক্। কিন্তু পত্রসাহিত্যের স্বরূপ সন্ধানপর্বে পত্রের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা প্রয়োজন। পত্র ব্যক্তিমনের সৃষ্টি এবং দাতা ও গ্রহীতার সম্পর্কের নির্দিষ্ট সরণিতেই এর গতিবিধি সীমাবদ্ধ। যার কাছে পত্রদাতা জীবনের সুখ-দুঃখ আশা-আনন্দের কথা অকপটে নিবেদন করে হৃদয়ের ভারমুক্তির আনন্দকে আস্বাদ করতে পারে তাকেই পত্রের গ্রহীতা নির্বাচন করে। পত্র তাই ব্যক্তি বিশেষের প্রতি ব্যক্তি বিশেষের নিঃশব্দ সংলাপ এবং এক জনের মানসিকতার প্রতি দৃষ্টি রেখে অপরজন সংবাদ সরবরাহ করে। কিন্তু আব এক শ্রেণীর পত্র আছে যার মূল্য শুধু ব্যক্তিগত নয়, সমাজগত। ব্যক্তি ও কালের সীমাকে পার হয়ে সে পত্র শাশ্বত কালের সীমায় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। ব্যক্তিগত প্রয়োজন চরিতার্থতার ঊর্ধ্বে তার সাহিত্যিক মূল্য যুগে যুগে স্বীকৃত হয়ে থাকে। সে পত্র তাই পত্রসাহিত্য। প্রয়োজনের কাছে এই চিঠি দাসখত লিখে দেয় না। তবে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক ভাবে এই শ্রেণীর পত্ররচনাও সম্ভব নয়; ব্যক্তি-জীবনের ভাললাগা মন্দলাগা অনিবার্য ভাবেই এর সঙ্গে সমন্বিত হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীশচন্দ্র দাশের অভিমতটি প্রণিধানযোগ্য :

> "...লেখকের অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শনের কথা পাই, তাঁহার সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব প্রত্যক্ষ করি..."[১]

ইংরেজী সাহিত্যে পত্রসাহিত্যের বিভাগটি যথেষ্ট সমৃদ্ধ এবং ফ্রান্সে পত্রসাহিত্যের সম্রাট ভল্টেয়ার। এই জাতীয় পত্র-সাহিত্যে ইংরেজ কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে ডাঃ জন্‌সন্, কুপার, চেষ্টারটন, ষ্টিভেন্‌সন, বায়রন, কীট্‌স, লরেন্স প্রমুখ উচ্চতর সাহিত্য-কর্মের স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রাক্-রবীন্দ্র যুগের বাংলা সাহিত্যে পত্রসাহিত্যের ভাণ্ডার তেমন সমৃদ্ধ নয়। মধুসূদনের চিঠিপত্র এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হলেও সবগুলিই ইংরেজীতে লেখা।

১. শ্রীশচন্দ্র দাশ—সাহিত্য-সন্দর্শন; পৃ. ১০৫; দ্বিতীয় সং ১৯৪৭।

ভ্রমণের সৃষ্টি হয়েছে মানুষের অজানাকে জানার, অদেখাকে দেখার অদম্য আকাঙ্ক্ষা থেকে। শিক্ষা বা জ্ঞান কেবল পুস্তক পাঠেই সম্পূর্ণ হয় না, সেই সম্পূর্ণতার জন্য চাই চাক্ষুষ দর্শন। এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও আনন্দকেই ধরে রাখবার জন্য ভ্রমণ কাহিনী সৃষ্টি হয়েছে। পরিব্রাজকের ভ্রমণপথ ও প্রবাসজীবনের অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও উপভোগের সরস বর্ণনার সঙ্গে স্থানবিশেষের ইতিহাস, পুরাবৃত্ত, ভৌগোলিক সৌন্দর্য, জনজীবনের উদ্ভব ও বিকাশ থেকে বিলুপ্তি, সমাজ জীবনের আচার-আচরণের কৌতুককর ও কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা এবং নিজের দেশের অবস্থা ও জনজীবনের সঙ্গে তুলনা, এই সব হল ভ্রমণ কাহিনীর মোটামুটি বর্ণনীয় বিষয়। এখানে আত্মগত ভাবনা (subjective) প্রকাশেরও যথেষ্ট সুযোগ আছে। বর্ণনীয় বিষয়ের ক্লান্তিকর একঘেয়েমী থেকে পাঠকের মানসিক বিশ্রামের জন্য গল্পের স্বাদুতা সঞ্চারের অবকাশও এই শ্রেণীর সাহিত্যে থাকে। কিন্তু লঘু-চপল মুহূর্ত সৃষ্টি করা লেখকের অভিপ্রেত বলে পাঠকের 'সিরিয়াস' হওয়ার প্রয়োজন হয় না। দৃশ্যমান বস্তু, দেশ ও তার ভৌগোলিক বৃত্তান্তের নৈষ্ঠিক বর্ণনা অর্থাৎ 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতম্'-ই ভ্রমণ কাহিনীর মূল সর্ত নয়; বহির্দৃষ্টির সঙ্গে অন্তর্দৃষ্টির সংযোগ ও ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত হলে, তবেই উৎকৃষ্ট ভ্রমণ-সাহিত্য সৃষ্টি হয়। এই প্রসঙ্গে জনৈক ইংরেজ সমালোচক বলেছেন :

> "A first-rate travel book depends comparatively little upon strangeness or remoteness of locality, and much upon the character and vision of the traveller." [১]

এখন এই ত্রিবিধ রীতির বৈশিষ্ট্যের অনুসরণে পরিব্রাজক গ্রন্থটিকে কোন্ শ্রেণীভুক্ত করা যায় তাই বিচার্য। প্রত্যক্ষ দৃশ্যের

১. A.C. Ward—Twentieth Century Literature, p.-129.

যেখানে বাস্তবসম্মত বর্ণনা দিয়েছেন, সেখানে কখনও হঠাৎ যেন তাঁর রূপমুগ্ধ কবিপ্রাণের জাগরণ ঘটেছে এবং বর্ণনা সেখানে আন্তর -সত্যের রূপময় অভিব্যক্তিতে গীতিধর্মী হয়ে উঠেছে। গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমির শ্যামল শোভা বর্ণনায় বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় এ যেন বিশেষের মধ্যে নির্বিশেষকে খোঁজায় তাঁর মন-প্রাণ বিভোর হয়ে উঠেছে, দৃষ্টিতে লেগেছে রঙের নেশা ঃ

> "......তার নীচে ঝোপ ঝোপ তাল নারিকেল খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মত হেল্‌চে, তার নীচে ফিকে, ঘন, ঈষৎ পীতাভ একটু কাল মেশান, ইত্যাদি হরেক রকম সবুজের কাঁড়ী ঢালা আম নীচু জাম কাঁটাল..... ।"

তাছাড়া গঙ্গার রূপচিত্র-অঙ্কনে যে আন্তরিকতার প্রকাশ ঘটেছে তা' যেন আপন হৃদয়ের গোপন খাতায় স্বগতোক্তিসমূহের অলিখিত ডায়েরিবদ্ধ রূপ। একই সঙ্গে তা' আবার পরিব্রাজকের উপলব্ধি ও উপভোগের সরস চিত্রাত্মক বর্ণনা। সন-তারিখ চিহ্নিত রোজনামচার প্রতিশ্রুতি থাকলেও ডায়েরির সীমাকে অতিক্রম করে এইসব খণ্ড-বিচ্ছিন্ন ভাব ও ভাবনা যেন কাব্যের সীমায় এসে পড়েছে। পদ্মার জলপ্রবাহের সমান্তরালে তীরবর্তী ভূখণ্ডে নিসর্গ চিত্রের যে শোভাযাত্রাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছিন্নপত্রে'র পাতায় পাতায় অঙ্কন করে পত্রকে সাহিত্যে উত্তীর্ণ করেছেন, বিবেকানন্দও সেই পত্রাকারে প্রেরিত এই অংশের ভ্রমণ-বৃত্তান্তকে ভ্রমণ-কাহিনী, পত্রসাহিত্য ও ডায়েরির ত্রিবিধ রীতি-আশ্রয়ী করে তুলেছেন। তবে ডায়েরি অপেক্ষা ভ্রমণ-কাহিনী ও পত্রসাহিত্যের এলাকা এখানে অধিক প্রসারিত। আবার যাত্রাপথে বিদেশী সহযাত্রীদের আকৃতি, প্রকৃতি ও আহার-বিহারের বর্ণনা, নদীপথের নাব্যতা ও দুর্গমতা, জলযানের ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে বিষয়নিষ্ঠ বর্ণনা পত্র ও ভ্রমণ-কাহিনীর অঙ্গীভূত বিষয়।

যে দেশবাসী নিজেদের মধ্যে কৃত্রিম বর্ণবিভেদের ফলে ব্যবধান

সৃষ্টি করেছে বিদেশী জাহাজ কোম্পানির পরিচালকদের কাছে তার সামগ্রিক পরিচয় ঘটেছে 'নেটিভ' বলে :

"এখন এস না এগিয়ে ? সব 'নেটিভ' সরকার বলচেন। ও কালোর মধ্যে আবার এক পোঁচ কম বেশী বোঝা যায় না ; সরকার বল্‌চেন,—সব 'নেটিভ'।"

ভারতবাসীর এই হীনম্মন্যতাকে যেমন তিনি ধিক্কার জানিয়েছেন, তেমনি ইংরেজের সমতাবিধানের প্রচেষ্টাকে মৌখিক সাধুবাদ জানালেও তাঁর অন্তরের বেদনার সুরটিও পাঠকের কাছে অশ্রুত থাকেনি। আবার জাহাজে নিম্নবর্ণের বাঙালী খালাসীদের কর্তব্য-পরায়ণতা, কর্মতৎপরতা, দৈহিক সবলতা, নির্ভিকতা লক্ষ্য করে তাঁর স্বদেশপ্রেমিক চিত্তে যে উল্লাসের সঞ্চার হয়েছে—ভ্রমণ বৃত্তান্তের মধ্যে তা' স্পষ্ট ভাবেই ফুটে উঠেছে। এই প্রসঙ্গেই তিনি প্রত্যয়নিষ্ঠ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, এই নিম্নবর্ণের মানুষ যারা চিরকাল উচ্চবর্ণের মানুষের কাছে কেবল লাঞ্ছনা-বঞ্চনা ভোগ করেছে তারাই হবে আগামী দিনের ভারতবর্ষের রূপকার। এরা কেবল ভারতেরই শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেনি এদের শ্রমের ফসল যুগ যুগ ধরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশ ভোগ করেছে—তার নিদর্শন লক্ষ্য করেছেন বাবিল, ইরাণ, আলকসন্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে। 'রাশিয়ার চিঠি'তে রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ রাশিয়ার শ্রমজীবী মানুষের প্রতি লক্ষ্য করে বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের কথা স্মরণ করেছেন এবং ভারতের সঙ্গে ভ্রমণরত দেশের তুলনা করেছেন। ভ্রমণসাহিত্যের বিষয়নিষ্ঠতা সেখানে হৃদয়ানুভবকে জাগিয়ে তুলেছে এবং সেই দেখার অংশ যেমন ভ্রমণ-কাহিনীর বিষয় তেমনি দেখার প্রতিক্রিয়া অংশ আত্মগত ভাবনার বাহন ডায়েরির অন্তর্ভুক্ত হবার দাবী রাখে। আবার সুদূর পারিসে বাঙলার মুখ উজ্জ্বলকারী সন্তান জগদীশচন্দ্র বসুর

উপস্থিতির কথা বলতে গিয়ে তাঁর অন্তরে স্বদেশের প্রতি মমত্ববোধ ও ব্যাকুলতার প্রকাশ ঘটেছে :

> "আর আমার জন্মভূমি—এ জার্ম্মান, ফরাসী, ইংরাজ, ইতালী প্রভৃতি বুধমণ্ডলী-মণ্ডিত মহা রাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রাতিভমণ্ডলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন,—সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে, সি, বোস!"

—সংবাদ সরবরাহ ও মানসিক প্রতিক্রিয়ার মিশ্রপ্রকাশ ভ্রমণকাহিনী-মূলক পত্র ও ডায়েরির যুগ্ম-সওয়ারেই পরিবেশিত হয়েছে।

'পরিব্রাজক' গ্রন্থে ডায়েরি, পত্রসাহিত্য এবং ভ্রমণকাহিনীর মিশ্ররীতি যেমন লক্ষ্য করা যায় তেমনি ভ্রমণ-কাহিনীর মৌলিক স্বাদও এর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে অনুভূত হয়, বরং বলা যায় সমগ্র 'পরিব্রাজক' গ্রন্থের দুই-তৃতীয়াংশেরও অধিক স্থান জুড়ে ভ্রমণ-কাহিনীর রসবিস্তার ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের 'জাপানে পারস্যে' গ্রন্থের 'জাপানযাত্রী' অংশে দেশ জাতি ও একটি কালের যেমন তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনা আছে অথবা 'রাশিয়ার চিঠি'তে যেমন একটি দেশের সমগ্র জাতির জীবনচর্যার ইতিহাস আছে তেমনি পরিব্রাজকের নানা অংশে দেশ ও বিদেশের ভৌগোলিক সৌন্দর্য, ইতিহাস ও পুরাবৃত্ত, জনজীবনের রীতি-নীতি, আচার আচরণের বহু তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। সিংহলবাসীদের বৌদ্ধধর্মাচার ও রামানুজী অদ্বৈতবাদীদের ধর্মাচরণের কৌতুককর বিবরণ; ইরাণ, পারস্য, বাবিল, গ্রীস, পাশ্চাত্য সভ্যতার মহাকেন্দ্র কনস্টান্টিনোপ্‌ল-এর বর্ণনায় সুদূর অতীত নিকট বর্তমানে উপস্থিত হয়েছে। মহাবিশ্বের বিশাল জনতা, তাদের ধর্মাচরণ, সমাজ-জীবন এবং উত্থান-পতনের অতীত ও বর্তমান নিয়ে যেন পরিব্রাজক স্বামীজী

পাঠকের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এই গ্রন্থটিতে বিশেষভাবে প্রমাণিত হয় যে, বিবেকানন্দের ভ্রমণ-কাহিনী রচনার কৌশলটি যথেষ্ট আয়ত্তাধীন ছিল, তাই এত সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিশ্ব-ব্যাপকতা সঞ্চার করে দিতে পেরেছেন। আবার রূপের দেখা যাতে রসের দেখায় পরিণত হয় তার জন্য কৌতুককর বহু ঘটনা ও গল্পরস পরিবেশন করেছেন। এই প্রসঙ্গে দু'একটি গল্পের উল্লেখ করা যায়; যেমন সমুদ্র সঙ্গমের স্থানে গঙ্গার জেম্‌স্ ও মেরী নামে দু'টি চড়ার বিপদ থেকে নির্বিঘ্নে জাহাজের অতিক্রম-কামনায় গঙ্গার উদ্দেশে পাঁঠা মানতের প্রসঙ্গ ওঠে এবং সেই সূত্র ধরে তিনি গঙ্গাহীন দেশে মৃত শ্বশুরের-অস্থি মিশ্রিত দুধ গঙ্গাতীরবাসী জামাতাকে ভক্ষণ করিয়ে শ্বশুরের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটানোর কৌতুককর গল্পের অবতারণা করেন। সিংহলে রামানুজী সম্প্রদায় ও বাঙলা দেশের বৈষ্ণবদের তিলক কাটা এবং সুয়েজ খালে হাঙর ধরার কৌতুককর ঘটনা অনুরূপ ভাবেই দীর্ঘ বর্ণনা পাঠের ক্লান্তি অপনোদনের জন্য পরিবেশিত হয়েছে।

ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে প্রথিতযশা গুণী জ্ঞানী ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ অপেক্ষা, সাধারণ অপরিচিত মানুষ এবং পথিক-জনের সঙ্গে ক্ষণ-মিলনের চরিত্র-চিত্র একটি বিশিষ্ট সম্পদ বলে বিবেচিত হয়, সেই সর্ত পরিব্রাজক-রচয়িতা যথাযথ ভাবেই পূরণ করেছেন। সিংহলের বিবেকানন্দ-ভক্ত আলাসিঙ্গা পেরুমিল, পারিসে বাঙালী বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু; পাশ্চাত্য দেশের তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী মাদাম্ সারা বারন্‌হার্ড ও সর্বশ্রেষ্ঠা গায়িকা কালভে, প্রসিদ্ধ লেখক মস্যিয় জুল্ বোওয়া, ভিক্তর হ্যুগো'র প্রশংসাধন্য পেয়র হিয়াসান্থ ও তাঁর সহধর্মিণীর চরিত্র-চিত্রণে যেমন নিপুণতা দেখিয়েছেন তেমনি অপরাপর সহযাত্রী ও যাত্রাপথে স্বল্পপরিচিত অথবা একান্ত অপরিচিত জনের অসংখ্য চরিত্র-চিত্র আছে। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথের 'পথের সঞ্চয়ে' কবি 'য়েট্‌স,' 'স্টপফোর্ড ব্রুক,' 'রোদেনস্টাইন' প্রমুখ প্রখ্যাত ইউরোপীয় মনীষীদের বৃত্তান্ত যেমন সবিস্তারে আছে তেমন

ভাবে সাধারণ মানুষকে রচনায় স্থান দেওয়া হয়নি। 'ছিন্নপত্রে' কিন্তু নাম-গোত্রহীন বহু মানুষের উপস্থিতি ঘটেছে এবং এদিক থেকে 'পথের সঞ্চয়' অপেক্ষা 'ছিন্নপত্র' ভ্রমণ-কাহিনীর উপকরণে অধিকতর পূর্ণ।

'পরিব্রাজক' এই শিরোনামটিই ভ্রমণমূলক রচনার পরিচায়ক। বিবেকানন্দের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত এই রচনার মধ্যে তাঁর বহির্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি যথাযথ ভাবেই সমন্বিত হয়েছে এবং এই হিসাবে পরিব্রাজক গ্রন্থটিকে একটি উৎকৃষ্ট ভ্রমণসাহিত্য বলা সঙ্গত। তবে ভ্রমণসাহিত্যে পত্র, ডায়েরি ছোটগল্প ও প্রবন্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন রীতির মিশ্রণ থাকে। রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' পত্রধর্মী, 'রাশিয়ার চিঠি' ও 'পথের সঞ্চয়' প্রবন্ধধর্মী; সাম্প্রতিক কালে প্রবোধ সান্যালের 'মহাপ্রস্থানের পথে' উপন্যাসধর্মী, যাযাবরের 'দৃষ্টিপাত' গল্পধর্মী, মনোজ বসুর 'চীন দেখে এলাম' ডায়েরীধর্মী, অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পথে প্রবাসে' ও 'জাপানে'—এই দু'টি ভ্রমণ-কাহিনীতে গল্প ও প্রবন্ধেব যৌগপদ্য স্থাপিত হয়েছে। এই রীতি বিশেষের দিকে লক্ষ্য রেখে বলা যায় বিবেকানন্দের পরিব্রাজকে ডায়েরি, পত্র ও প্রবন্ধ-রীতি-মিশ্রণের আনুপাতিক হার বেশি।

৩

॥ গদ্যশিল্পী বিবেকানন্দ ॥

বাংলাভাষার কারুকৃতি নির্মাণে বিবেকানন্দের যে অসাধারণ দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে তা' তাঁকে বাংলা গদ্যের ইতিহাসে স্মরণীয় করে রাখবে। কালানুক্রমিক ভাবে বিবেকানন্দের চারটি গদ্য রচনা —'ভাববার কথা' 'বর্তমান ভারত' 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', এছাড়া তাঁর ইংরেজী ও বাংলা পত্রাবলী এবং 'জ্ঞানযোগ', 'রাজযোগ' প্রভৃতি বক্তৃতা (ইংরেজী ও বাংলা)—এগুলি তাঁর সাহিত্য-চিন্তার নিদর্শন। বিশুদ্ধ সারস্বত প্রেরণায় সরস্বতীর মানস-সরসে তিনি অবগাহন করেননি; আপন ব্রতপালন উপলক্ষ্যে অর্থাৎ শিক্ষা ও বাণী প্রচার, জাতীয় চরিত্রোন্নতি ও সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনে তিনি গদ্য রচনা করেন। কিন্তু সেই গদ্য অসাধারণ ভাবগাম্ভীর্য, ব্যঞ্জনাশক্তি, অর্থবহন-ক্ষমতা ও তীব্র গতিশক্তি লাভ করেছে। ইংরেজী, ফার্সি ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁর যে অধিকার ছিল স্বামীজীর বাংলা ও ইংরেজী রচনায় তা' নিষ্ফল হয় নি। 'Style is the man' এবং 'Style is the physiognomy of the mind'—এই উভয় উক্তির সমর্থন বিবেকানন্দের গদ্যশৈলী; বিবেকানন্দের চরিত্র-দার্ঢ্য, বলিষ্ঠতা, ঋজু জীবনাদর্শ, গম্ভীর কণ্ঠ, মহৎ মনুষ্যত্ববোধ ও উদাত্ত বীর্যবত্তা তাঁর গদ্যে অনায়াসে সঞ্চারিত হয়েছে। এমনকি তাঁর বসনের গৈরিকতা তাঁর গদ্যে একপ্রকার নিস্পৃহ দার্শনিকতা ও বৈরাগ্য এনে দিয়েছে। ধর্মব্রতে যাঁরা দীক্ষিত কর্মব্রতে যাঁরা নিবেদিতপ্রাণ; তাঁরা শিল্প, সঙ্গীত, কলাবিদ্যা অথবা ভাষা ও সাহিত্যে পারঙ্গমতা অর্জন করতে পারেন,

কিন্তু তাঁদের ভৌমচেতনালব্ধ শিল্প-প্রত্যয়গুলি ভূমিচারিতার একটু উর্ধ্বলোক দিয়েই প্রবাহিত হয়। কিন্তু বিবেকানন্দের ভূমা এবং ভূমিবোধ কর্ণের রথের মত মন ও প্রাণের মাটি বিদীর্ণ করে অগ্রসর হয়েছে।

রামমোহন থেকে অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর; বঙ্কিম থেকে বিবেকানন্দ—এঁদের হাতে বাংলা গদ্যের কেবল পুষ্টি সাধনই হয়নি, বাংলাগদ্য ক্ষুরধার অসিতে পরিণত হয়েছে। গদ্যভাষা জাতির মনন-মানসের পরিবর্তনে যে কি প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করতে পারে তা' উনিশ শতকেব শেষার্ধে রচিত বাংলা প্রবন্ধধারার পরিচয় গ্রহণ না করলে বোঝা যাবে না। শিল্পলক্ষণ অর্জন সে যুগের রচনায় তখনও হয়তো সম্ভব হয়নি, কিন্তু সমাজ ও জীবনের সঙ্গে এই বাঙ্‌ময় সেতু যে ঘনিষ্ট যোগাযোগ গড়ে তুলেছিল সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। উনিশ শতকের একেবারে শেষের দিকে কিছু কিছু চিঠিপত্র ও দু'চারটি প্রবন্ধেব মধ্যে দিয়ে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের সাহিত্যিক সত্তার সসংকোচ প্রকাশ ঘটতে থাকে। অবশ্য সেই সময়েই বাংলা গদ্যেব আশ্রয়ে কিছু কিছু সপ্রশংস শিল্পকর্মের মন্থর পদযাত্রা শুরু হয়েছে। বিবেকানন্দ কিন্তু সেই প্রেরণার বশবর্তী হয়ে শিল্প-সাফল্য অর্জনের প্রতিযোগিতায় যোগদান করেননি। অকৃপণ মানবপ্রীতির পাববশ্যেই তাঁর সাহিত্যিক এষণা—নরকে নারায়ণে পরিণত করাব বীজমন্ত্রই তিনি তাঁর গদ্য বচনার মধ্য দিয়ে উচ্চারণ করেছেন। ভারতবাসীকে মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর কলম ধবার সর্বপ্রধান সর্ত। জ্ঞানে-বীর্যে-কর্মে পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করে তোলার জন্য তাঁব রচনায় জ্ঞানবিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম যেমন স্থান পেয়েছে তেমনি আছে স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি গভীর ভালবাসা এবং কৌতুক ও কৌতুহলপূর্ণ সরস পরিবেশন নৈপুণ্য।

বাংলা গদ্যের সমীক্ষা করলে লক্ষ্য করা যায় যে আধুনিক রীতির প্রবর্তনের কৃতিত্ব মিশনারি সম্প্রদায় অথবা দেবভাষার ছত্রছায়াতলে

পণ্ডিতগণের সাহিত্যচর্চার নয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের পয়ার-ত্রিপদীর চলন সাধু গদ্যরীতি পর্যন্ত কোন রকমে আসতে পেরেছে। কিন্তু উনিশ শতকেই বাঙালী বাংলা গদ্যের মধ্যে আবিষ্কার করেছে যে, চিঠিপত্র দলিল-দস্তাবেজের ভাষাকেই কালে সহজ ও সার্থকভাবে আবেগ ও মননের ভাষায় রূপান্তরিত করা যাবে। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য-পোতবাহিত আধুনিকতাকে বাংলা গদ্যের সরণীতেই বাঙালী তার জীবনের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গে গ্রহণ করেছে।

বিবেকানন্দ ও সেই আধুনিকতার বার্তাকে ধর্ম—দর্শন, সমাজকথা, স্বদেশ ও স্বজাতি প্রীতির মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত করার চেষ্টা করেছেন। প্রয়োজনধর্মী এই সব রচনায় তাঁর বিশিষ্ট গদ্যরীতি এমন একটি বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত করে দিয়েছে, যার ফলে অতি সাধারণ কথাও তীব্র জ্যোতির্ময় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে এবং নিতান্ত স্থূল ধাতব-বক্তব্য তাঁর এই বিশিষ্ট প্রতিভায় এমন শক্তি আহরণ করেছে যে, শ্রবণমাত্রই যে কোন ব্যক্তি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত হয়ে পড়ে। বাংলা চলিত রীতিকে তিনি যে একটা বিপুল বেগ ও বিস্ময়কর প্রাণশক্তি দান করেছেন, তা সর্বজনস্বীকৃত। সাধু রীতি-নির্ভর রচনাগুলিতেও অনুরূপ পরিবেশননৈপুণ্য, ধ্বনিগাম্ভীর্য এবং সর্বোপরি ক্লাসিক বৈভব ফুটে উঠেছে; 'বর্তমান ভারতে'র ভাষারীতি এ বিষয়ে যথেষ্ট সাক্ষ্য বহন করে। তাঁর এই গদ্যরীতির সঙ্গে পাশ্চাত্য লেখক 'জেরিমি টেলর, কার্ডিন্যাল নিউম্যান'[১]—অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে মিলটনের ইংরেজী গদ্যরীতির সঙ্গে তুলনা করা যায়।

'বর্তমান ভারতে' স্বামীজী ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পূর্বাপর আলোচনা প্রসঙ্গেবৃহৎ মানবচেতনার জড়ত্বের কারণ; প্রাচীন ভারতের পুরোহিত-রাজন্য-বৈশ্যশাসিত সমাজের অবস্থা প্রভৃতি তাঁর

১. বিশ্ববিবেক—Dr. Srikumar Banerjee: Swami Vivekananda as a speaker and writer of English.

অধীত সমাজতত্ত্ব-বিদ্যার আলোকে নিপুণ ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং প্রাচীন ও বর্তমান ভারতের সংযোগ-সেতু আবিষ্কার করেছেন। অতীতের অন্ধকারে অনিবার্য ভাবেই ঘটেছে পুনঃপুনঃ মানস-পর্যটন। এই বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বিশুদ্ধ সাধুভাষার সাহায্য নিয়েছেন এবং সেখানে ক্লাসিক গদ্যের অসাধারণ বৈভব ফুটে উঠেছে :

"সৈন্যসহায়, মহাবীর, শস্ত্রবল রাজগণের অপ্রতিহত বীর্য ও একাধিপত্যের সম্মুখে প্রজাকুল, সিংহের সম্মুখে অজাযূথের ন্যায় নিঃশব্দে আজ্ঞা বহন করে, তাহাও দেখিয়াছে;···"

অথবা

"বৌদ্ধযুগের একচ্ছত্র পৃথিবীপতি সম্রাড়্গণের ন্যায় ভারতের গৌরববৃদ্ধিকারী রাজাগণ আর কখনও ভারত সিংহাসনে আরূঢ় হন নাই।"

—এই অংশের বাক্যগঠন তৎসম শব্দবহুল, সমাসসন্ধি সমাকীর্ণ, দীর্ঘ বিলম্বিত ছাদের তৎসম শব্দ-শৃঙ্খলিত সুচিন্তিত প্রয়োগনৈপুণ্যে বিশিষ্ট সাধুগদ্যের নিদর্শন।

একই গ্রন্থে বিবেকানন্দের সাধুগদ্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য সুপরিস্ফুট হয়েছে, সেখানে একেকটি অনুচ্ছেদের প্রথমে নিশ্চয়ার্থক একটি করে ক্ষুদ্র বাক্য ব্যবহার করে হাল্কা বাক্‌রীতির সৃষ্টি করেছেন :

"কিন্তু আশা আছে। কালপ্রভাবে ব্রাহ্মণাদি বর্ণও শূদ্রের নিম্নাসনে সমাসীন হইতেছে এবং শূদ্র জাতিও উচ্চ আসনে উত্তোলিত হইতেছে।"

অথবা

"দোষও আছে; প্রাণস্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবীজ উপ্ত। অন্ধকার আলোর সঙ্গে সঙ্গেই চলে।"

প্রথম অনুচ্ছেদটি ইতিহাসের বিরাট-ব্যাপক ও স্থান-কালের বিশালতাকে তুলে ধরতে গিয়ে বাক্যগঠনকেও কিঞ্চিৎ দীর্ঘ ও জটিল

করে তুলেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বুদ্ধিগ্রাহ্য মন্তব্যগুলিকে ছোট ছোট বাক্যে এমন ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যাতে পাঠকের চিন্তায় খুব সহজেই স্থান পায়। প্রথমটিতে যেন বাগ্মী ও দ্বিতীয় অংশে কথক বিবেকানন্দের প্রকাশ ঘটেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় যে আবেগময়তা ছিল তাও বিবেকানন্দের মধ্যে সার্থক হয়েছে 'বর্তমান ভারতে'র শেষ অংশে, যেখানে নিরপেক্ষ প্রবন্ধরীতি অকস্মাৎ উদাত্ত প্রার্থনা, স্বগতোভাষণ বা উর্ধ্বগ্রীব-প্রতিজ্ঞায় পরিণত হয়েছে:

> "ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশু-শয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিন রাত—হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

এর সঙ্গে অনিবার্যভাবে মনে আসে:

> "এসো মা নবরাগ রঙ্গিণী, নব বলধারিণি, নবদর্পে দর্পিণি, নব স্বপ্নদর্শিনি!—এসো মা গৃহে এসো—ছয় কোটি সন্তানেবে একত্রে এককালে দ্বাদশ কোটি কর জোড় করিয়া তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব।"[১]

॥ ২ ॥

বিবেকানন্দের গদ্যরীতির সর্বাধিক বিস্ময় তাঁর চলিত ভাষায়। 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', কিছু চিঠিপত্র এবং 'ভাববার কথা'য় সংকলিত দু'একটি বিচিত্র নিবন্ধ তাঁর চলিত গদ্যরীতির রচনা। বাংলা গদ্যের চলিত রীতি আধুনিক নাগর-জীবনের বাণীবাহক, সাধুরীতিটি সে তুলনায় প্রাচীনতারই স্মারক। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সাধু গদ্যের বহুল চর্চার সঙ্গে চলিত গদ্যের

১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—আমার দুর্গোৎসব।

স্বল্প-দূরত্ব পদচারণা ঘটলেও তা' সাধুভাষারই নামান্তর। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উদ্যোগে রামরাম বসুর সাধুভাষায় রচিত প্রথম প্রকাশিত 'প্রতাপাদিত্য চরিত' ও চলিত ভাষায় রচিত প্রথম বই উইলিয়ম কেরীর 'কথোপকথন'—বই দু'খানির একটিতে সাধুভাষার যেমন বিড়ম্বনা অন্যটিতে চলিত ভাষারও তেমনি বিপর্যয় লক্ষণীয়। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে সাহিত্যে সঙ্কুচিতভাবে কলকাতাবাসীর কথ্য ভাষা স্থান পেতে থাকে। নাটকে ভদ্রেতর ব্যক্তির সংলাপে ও উপন্যাস—রমন্যাসে কলকাতার চলতি ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটতে লাগল।

১৮৬২ সালে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' প্রকাশিত হয় এবং তার পরের বছর ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুআরি বিবেকানন্দের জন্ম হয় এবং এর প্রায় ৩৬ বছর পরে 'পরিব্রাজক' বইটি লেখেন। তারও পূর্বে প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-৮৩) হালকা-চালের সাধুভাষার রচনায় স্থানে স্থানে কলকাতার চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন; চলিত ভাষার পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার কোন রচনাতেই করেননি। কালীপ্রসন্নের রচনায় চলিত রীতির পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার লক্ষ্য করা গেল—কলকাতার কক্‌নি বুলির রীতিতে ক্রিয়াপদ ও সর্বনামগুলি পর্যন্ত বিকৃত ভাবে ব্যবহৃত হয়। কালীপ্রসন্ন রঙ্গব্যঙ্গমূলক রচনায় কলকাতার কক্‌নির ব্যবহার করেছেন, কিন্তু গভীরতা ও মননশীলতার ক্ষেত্রে ক্লাসিক সাধুরীতির আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু সকল প্রকার ভাব ও বিষয়ের আলোচনায় যে চলিত গদ্য স্বচ্ছন্দ বাহন হতে পাবে, বিবেকানন্দের পূর্বে কোন সাহিত্যিক প্রচেষ্টায় তা' লক্ষ্য করা যায়নি। বিবেকানন্দই প্রথম এই দুঃসাহসিক কাজে সাফল্য অর্জন করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় 'Calcutta Review' পত্রে সাহিত্যে চলিত ভাষা ব্যবহারের সমর্থনে জোরাল বক্তব্য রাখেন এবং তৎসম শব্দ ব্যবহারের ঘোরতর বিরোধিতা করে তদ্ভব ও দেশজ শব্দ ব্যবহাব অনুমোদন কবেন;

অবশ্য-বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই তৎসম শব্দের প্রতি বিতরাগ সমর্থন করেন-নি। 'সবুজপত্রে'র পূর্বে রবীন্দ্রনাথও সর্বপ্রকার রচনায় চলিত ভাষার প্রয়োগ-নৈপুণ্যে সিদ্ধি অর্জন করতে পারেননি। পরবর্তী কালে প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথের বহুল প্রয়োগে চলিত ভাষা গতিলাভ করেছে। তবে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর চলিত ভাষার উৎস সাধু ভাষা ; সাধু ভাষারই একটা কৃত্রিম কথ্যরূপ তাঁরা তৈরি করেছেন চলিত ভাষার নামে। মুখের কথাকে সাহিত্যের সর্বস্তরে প্রয়োগ-নৈপুণ্যে প্রথম সার্থকতা দেখিয়েছেন বিবেকানন্দ।

স্বামীজী বিশ্বাস করতেন যে-কোন চিন্তার ব্যাপারে, অনুসন্ধিৎসা, গবেষণা, তত্ত্বালোচনা—সমস্তই চলিত ভাষায় চলবে এবং এই প্রত্যয় নিয়েই চলিত ভাষা ব্যবহারে তিনি যেমন দক্ষতা দেখিয়েছেন, তেমনি নিজস্ব একটা ভাষারীতিও গড়ে তুলেছেন। তাঁর ভাষায় তৎসম শব্দ ব্যবহৃত হলেও মুখের ভাষাই ছিল তাঁর মনের ধাত্রী। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুআরি তারিখে 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদককে লেখা স্বামীজীব একটি চিঠিতে এই চলিত ভাষা সম্পর্কে তাঁর মনের ভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে :

> "চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে? ..স্বাভাবিক যে-ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না ; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ওভাষায় যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যে-দিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে তেমন কোন তৈরী ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ্ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা

> সংস্কৃতের গদাই-লস্করি চাল—ঐ এক চাল নকল করে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির উপায়, লক্ষণ।"[১]

বিবেকানন্দ 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' বিশুদ্ধ মুখের বুলি ব্যবহার করেছেন, এমন কি সংলাপ, রীতিনীতি, পরিহাস-রসিকতা ও মুদ্রাদোষগুলিকে পর্যন্ত পরিত্যাগ করেননি। অথচ হুতোম বা বীরবল কেউ-ই জীবন্ত ভাবে বিবেকানন্দের মত চলিত ভাষাকে সাহিত্যের মর্যাদায় উন্নীত করতে পারেননি। হুতোমের ভাষায় ঘরোয়া ও বে-আব্রু ভাব এবং প্রমথ চৌধুরীর ভাষা কৃত্রিম ও ড্রয়িংরুম-বিলাসী এবং ইচ্ছাকৃত বৈদগ্ধপূর্ণ। স্বামীজীর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র গদ্যই চলিত ভাষার উৎকৃষ্ট আদর্শ, 'পরিব্রাজকে'র ভাষাও চলিত, চিত্তাকর্ষী ; তবে চিঠির ভাষা বলে এতে ব্যক্তিগত ঘরোয়া ঢঙটি বেশি ফুটেছে। যে ভাষায় আমরা আলাপ করি, চিন্তা করি, সিদ্ধান্তে পৌঁছোই—সেই সহজ প্রত্যক্ষ সর্বজনবোধ্য চলিত গদ্যরীতির সার্থক নিদর্শন তাঁর এই দু'টি গ্রন্থে যত্রতত্র পাওয়া যাবে। আলংকারিকতা-বর্জিত নিরাভরণ মুখের ভাষায় কত গভীর কথা বলা যায় তার একটি নিদর্শন 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' থেকে উদ্ধার করা যায় :

> "ওহে বাপু, যীশুও আসেননি, জিহোবাও আসেননি, আসবেনও না। তাঁরা এখন আপনাদের ঘর সামলাচ্ছেন, আমাদের দেশে আসবার সময় নাই। এদেশে সেই বুড়ো শিব বসে আছেন, মা কালী পাঁঠা খাচ্ছেন, আর বংশীধারী বাঁশী বাজাচ্ছেন।"

এখানে লক্ষণীয় যে তৎসম ভাষার প্রয়োগের কোন লক্ষ্যই তাঁর নেই, একান্ত মুখের ভাষাই বাধাহীন স্বচ্ছ গতি লাভ করেছে। অথচ

---

১. স্বামী বিবেকানন্দ—ভাববার কথা ; বাঙ্গালা ভাষা ; স্বামী বিবেকানন্দে বাণী ও রচনা ; ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৫।

বীরবলের রচনায় বৈঠকী ভাষার কৃত্রিমতা সহজেই লক্ষ্য করা যায়—যে কোন রচনায় স্বাভাবিকতার চেয়ে চেষ্টাটাই চোখে পড়ে :

"যাঁর বোধ নেই, তিনিই কেবল সৌন্দর্যের দর্শন লাভের জন্য শিবনেত্র হন ; এবং যার মন নেই, তিনি মনস্বিতা লাভের জন্য অন্যমনস্কতার আশ্রয় গ্রহণ করেন।"

বিবেকানন্দের 'পরিব্রাজক' থেকে অনুরূপ আর একটি বিবৃতিমূলক গদ্যরীতির দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে :

"এবার ভূমধ্য সাগর। ভারতবর্ষের বাহিরে এমন স্মৃতিপূর্ণ স্থান আর নেই—এসিয়া, আফ্রিকা, প্রাচীন সভ্যতার অবশেষ। এক জাতীয় রীতিনীতি খাওয়া-দাওয়া শেষ হল, আর একপ্রকার আকৃতি প্রকৃতি, আহার বিহার, পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার, আরম্ভ হল—ইউরোপ এল। শুধু তাই নয়—নানা বর্ণ, জাতি, সভ্যতা, বিদ্যা ও আচারের বহু শতাব্দীব্যাপী যে মহা-সংমিশ্রণের ফল স্বরূপ এই আধুনিক সভ্যতা, সে সংমিশ্রণের মহাকেন্দ্র এইখানে।"

নিঃস্পৃহ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে দেখাটাই এখানে বড় কথা, সাহিত্যিক-কৌশল প্রকাশের সুযোগ এখানে নেই। কথ্য ভাষার ব্যবহার কত সহজ স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ অথচ কি গভীর অন্তরভেদী আবেদনের রূপ গ্রহণ করতে পারে তাঁর নিদর্শন তাঁর 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে আবেদনের উদাত্ততার মধ্যে ফুটে উঠেছে :

"......তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোপ-জঙ্গল পাহাড়-পর্বত থেকে।"

বর্ণনাধর্মী অংশে সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দ ব্যবহার করে চলিত ভাষায়

গাঢ় বাক্‌পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যে শব্দঝংকার আনয়ন করেছেন তা' যে কোন কালের দুঃসাহসী লেখকের কাছেও এক বিরাট বিস্ময় :

"সে পর্বতনির্ঝরবৎ কথাচ্ছটা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ চতুর্দ্দিকসমুত্থিত ভাববিকাশ মোহিনী সঙ্গীত মনীষি-মনঃ—সংঘর্ষসমুত্থিত-চিন্তামন্ত্রপ্রবাহ, সকলকে দেশকাল ভুলিয়ে মুগ্ধ করে রাখত !—তারও শেষ।"

—এই দীর্ঘসমাসবদ্ধ তৎসম শব্দবহুল বাক্য গঠনে প্রমাণিত হয় যে, শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মত তিনি তৎসম শব্দের প্রতি অকারণে খড়্গহস্ত হননি।

আবার তাঁর বর্ণনার সঙ্গে যখন সৌন্দর্যবোধের সম্মিলন ঘটেছে, সেখানে সাদাসিধে বর্ণনাও ভাষার সারল্যে বিচিত্র রূপলাবণ্যময় হয়ে উঠেছে :

"সে নীল নীল আকাশ, তার কোলে কাল মেঘ, সোনালি কিনারাদার, তার নীচে ঝোপ ঝোপ তাল নারিকেল খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মত হেল্‌চে, তার নীচে ফিকে, ঘন, ঈষৎ পীতাভ একটু কাল মেশান, ইত্যাদি হরেক রকম সবুজের কাঁড়ী ঢালা আম নীচু জাম কাঁটাল—পাতাই পাতা—গাছ ডাল পালা আর দেখা যাচ্ছে না, আশে পাশে ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেল্‌চে, দুল্‌চে, আর সকলের নীচে—যার কাছে ইয়ারকান্দী ইরানি তুর্কিস্তানি গালচে দুলচে কোথায় হার মেনে যায়—সেই ঘাস, যতদূর চাও সেই শ্যাম শ্যাম ঘাস, কে যেন ছেঁটে ছুঁটে ঠিক করে রেখেচে,......"

স্বভাবোক্তির সঙ্গে উৎপ্রেক্ষার, চোখে দেখা রূপের সঙ্গে মনের কথার আশ্চর্য সমন্বয় বাঙলাদেশের কোন গদ্যশিল্পীর রচনায় এর চেয়ে সার্থক, প্রাণবন্ত, বর্ণধ্বনিময় হতে পেরেছে ? মনে হয় যেন জীবনানন্দ দাশের রূপসী বাঙলার কাব্যময় বর্ণনাকে বিবেকানন্দ বহু পূর্বে গদ্যরূপের মধ্যে অসাধারণ বৈভব দান করেছেন।

অবনীন্দ্রনাথের মত এ যেন তুলি দিয়ে 'ছবি লেখা'। রোমান কবি হোরেস একেই বলেছেন—'Poetry is picture and picture is poetry'—বর্ণ ও ধ্বনির অপূর্ব সমন্বয়ে এ যেন চিত্রসাহিত্যে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিনের পরিচিত বিবর্ণদৃশ্য বর্ণনার মধ্যে কৌতুকের সুর সঞ্চারিত হলেও মাধুর্যের মিশ্রণে কৃপণতা দেখাননি :

> "কিন্তু কেবাঞ্চি ও ট্রাম-ঘড়ঘড়ায়িত ধূলিধূসরিত কলকেতার বড় রাস্তার ধারে কিংবা পানের পিক্‌বিচিত্রিত দেওয়ালে, টিকটিকি—ইঁদুর-ছুঁচো মুখরিত একতলার ঘরের মধ্যে দিনের বেলায় প্রদীপ জেলে আঁবকাঠের তক্তায় বসে থেলো হুঁকো টানতে টানতে, কবি শ্যামাচরণ হিমালয়, সমুদ্র, প্রান্তর, মরুভূমি প্রভৃতি যে হুবহু ছবিগুলি চিত্রিত কোরে বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন—সে দিকে লক্ষ্য করাই আমাদের দুরাশা।"

তাঁর চলিত ভাষার মধ্যে তৎসম-তদ্ভব-দেশজ শব্দের মিশ্রণ যেন একান্নবর্তী পরিবারের রূপলাভ করেছে—"সেই নির্মল নীলাভ জল, যার মধ্যে দশ হাত গভীরের মাছের পাখ্‌না গোনা যায়"—আবার তারই সঙ্গে "কর্দমাবিলা হরগাত্র-বিঘর্ষণশুভ্রা সহস্রপোতবক্ষা কলকেতার গঙ্গার" বর্ণনার সহাবস্থান ঘটেছে।

হুতোম ব্যঙ্গবিদ্রূপের কড়া চাবুক যেমন উত্তর কলকাতার কথ্যভাষায় তৈরি করেছিলেন তেমনি স্বামীজীও কৌতুকরস পরিবেশনের জন্য মৌখিক সংলাপের ঢঙেই বাক্যগঠন করেছেন :

> "বলি হ্যাঁগা, সমুদ্র পার হতে হনুমানের সি-সিকনেস হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে পুঁথিতে কিছু পেয়েছ? তোমরা পোড়ো পণ্ডিত মানুষ, বাল্মীকি-আল্মীকি কত জান; আমাদের গোঁসাইজী ত কিছুই বলেন না।"

একেবারে আটপৌরে ভাষায় কৌতুকরস পরিবেশন করেছেন, এ ভাষা কলকাতার খাঁটি ভাষা। নিরক্ষর রামকৃষ্ণের অলংকার বিহীন আটপৌরে ভাষার সর্বজনবোধ্যতার শক্তিতে তিনি যে প্রভাবিত

হয়েছিলেন, এ অনুমান বোধ করি অসঙ্গত হবে না। চলিত বাংলার নাগরিক ইডিয়ম তাঁর রচনার যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে—খাঁদা-বোঁচা ভাইবোন; ফুঁ-ফাঁ দিয়ে আগুন দিতে হয়; কায়েত-ফায়েতের বাপদাদা করেছে; লাথি ঝাঁটা; সোঁদর বন; আছুড় গা; মাগ; আদাড়ে; মাগী; এঁড়ে লাগা ছেলে; শোরের মাংস; চক্কর।

নাটকে সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়া বোঝানো হয়। কিন্তু তাঁর রচনার অসাধারণ নৈপুণ্যে এক আধারেই পরিবেশিত হয়েছে সংলাপ, ক্রিয়া ও বর্ণনা। সুয়েজ খালে হাঙ্গর ধরার বর্ণনা দিতে গিয়ে চলিত গদ্যের আশ্রয়ে তাঁর এই অসাধারণ সমন্বয়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

> "এবার সব চুপ্—নোড়ো-চোড়ো না, আর দেখ—তাড়াতাড়ি কোরো না। মোদ্দা-কাছির কাছে কাছে থেকো। ঐ, বঁড়শির কাছে কাছে ঘুরচে; টোপটা মুখে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছে। দেখুক। চুপ্ চুপ্—এইবার চিৎ হ'ল—ঐ যে আড়ে গিল্‌ছে; চুপ্—গিলতে দাও।"

চলিত ভাষাকে প্রমথ চৌধুরীর মত বিদগ্ধ ভব্যরূপ না দিয়ে তাকে মুখের ভাষার কাছাকাছি এনে, তাতে ওজঃ ও রস সঞ্চার করে তিনি চলিত গদ্যকে যে আকার দিতে চেয়েছিলেন তা যোগ্য উত্তর-সূরীত্বের অভাবে পরবর্তীকালে আর অনুসৃত হয়নি। প্রমথ চৌধুরীর চলিত গদ্যরীতি শিষ্য-সামর্থ্যের জোরে বাংলা সাহিত্যের দরবারে স্থায়ী আসন অধিকার করেছে। তবে নিঃসন্দেহে বলা যায়, প্রমথ চৌধুরী যেমন বলেছিলেন 'বাঁদরের ল্যাজ কেটে দিলেই কি মানুষ হয়?'—এ যেমন সত্য তেমনি সাধুভাষার ক্রিয়াপদ-সর্বনামকে ছোট করলেই চলিত ভাষা হয় না—তা' বিবেকানন্দ মুখের ভাষাকে সাহিত্য-কর্মে সার্থক ভাবে প্রয়োগ করে প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন।

৪

॥ সংকীর্ণতা ও মুক্তিসন্ধান ॥

ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতির প্রধান অন্তরায় শ্রেণী-বৈষম্য। ধর্মনৈতিক গোষ্ঠীচেতনা যেমন সমগ্র ভারতবাসীকে সুপ্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত করেছে তেমনি শ্রেণী-বৈষম্য এই উপদলগুলির মধ্যে সৃষ্টি করেছে কৃত্রিম বিভেদপ্রবণতা এবং এই বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার রন্ধ্রপথেই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীক ও সামাজিক বিপর্যয়ের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে। ঔপনিষদিক জীবন-ব্যবস্থায় গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে একদা যে শ্রেণীবিভাগ সৃষ্টি হয়েছিল পরবর্তীকালে দেশবাসীর সংকীর্ণ ধর্মচেতনা ও স্বার্থান্ধ মনোভাব সেই আদর্শ জীবনব্যবস্থাকে ধ্বংস করে। বিবেকানন্দ তাই প্রাচীন জাতিবিভাগ ব্যবস্থাকে সমর্থন জানিয়েছেন :

> "জাতিবিভাগ প্রাকৃতিক নিয়ম।···জাতিবিভাগ ভাল জিনিস। জীবনসমস্যা সমাধানের ইহাই একমাত্র স্বাভাবিক উপায়।··· যেখানেই যাও, জাতিবিভাগ থাকিবেই কিন্তু বিশেষ বিশেষ অধিকার থাকিবে না···কার্যবিভাগ থাকিবেই।"[১]

কিন্তু জাতিবিভাগ অর্থে পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা অথবা বিদ্বেষ সঞ্চার সমর্থনযোগ্য নয়। নৈতিক মান ও জীবনব্যবস্থা-উন্নয়নের জন্য যে জাতিবিভাগ একদিন সমাজ-স্বীকৃত হয়েছিল, সেই জাতি বিভাগের উদারনৈতিক চেতনা পরবর্তীকালে ভেদবুদ্ধি ও অহং-এর কবলগ্রস্ত হয়ে পড়ে। দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালনের আদর্শকে পরিহার করে উচ্চবর্ণের মানুষ নিম্নবর্ণের মানুষের বিরুদ্ধে ঘৃণা বর্ষণ করে সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার হীন তৎপরতা প্রকাশে লিপ্ত হয়ে

---

১. স্বামী বিবেকানন্দ—ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা ; পৃ. ১৩৭-১৩৮, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা ; ৫ম খণ্ড

পড়ে। মানবিক মূল্যবোধের অবসান সেখানে অনিবার্য হয়ে ওঠে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই জাতিভেদ সমস্যা দেশ ও জাতির সামনে এক অভিশাপ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। বিবেকানন্দ হিন্দু-শাস্ত্রানুমোদিত এই সমাজব্যবস্থাকে যুক্তি ও বিশ্লেষণের পথে এর যাথার্থ্য উপলব্ধি করার আহ্বান জানান ঃ

> "তুমি না হয় দার্শনিক, আমি না মৎস্যজীবী, কিন্তু তোমার ভিতর যে ঈশ্বর আছেন, আমার ভিতরও সেই ঈশ্বর আছেন।··· তুমি আমার মাথায় পা দিতে পার না।"[১]

কিন্তু বিবেকানন্দের সমকালীন ব্রাহ্মধর্মের প্রগতিশীল নেতা কেশবচন্দ্র সেন এই জাতি-ভেদ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ-ভাবে উচ্ছেদ করার সপক্ষে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্যদের উপবীত ত্যাগ ও জাতি নির্বিশেষে সকলের বেদী থেকে উপাসনা পরিচালনার সোচ্চার দাবী জানান। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে এই সূত্রে মতবিরোধের পরিণতিতেই কেশবচন্দ্র ও তাঁর প্রগতিশীল সমর্থকের দল ১৮৬৫ সালে 'ব্রাহ্মসমাজ' পরিত্যাগ করেন এবং কিছুদিন পর 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' গঠন করেন। কেশবচন্দ্রের থেকে বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য এইখানে যে, বিবেকানন্দ ধর্ম ও সমাজব্যবস্থাকে এক করে ফেলেন-নি। তাঁর বিশিষ্ট উপলব্ধি হল জাতিভেদ-প্রথার পশ্চাতে কোন ধর্মীয় সমর্থন নেই, সমাজব্যবস্থাকে যথাযথ পরিচালনার জন্যই বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব পালনের সূত্রে এই বর্ণ-বিভাগের সৃষ্টি হয়েছে।

জাতিভেদ সম্পর্কে ভ্রান্ত বিভেদ বোধ ও অজ্ঞতাহেতু সমগ্র ভারত-বাসী সর্বাত্মক পরিচয় বিস্মৃত হয়ে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। বিবেকানন্দ বিদেশ যাত্রা কালে ইংরেজ-প্রদত্ত ঘৃণ্য 'নেটিভ' সম্বোধনে চিহ্নিত হয়ে যে বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা

১. স্বামী বিবেকানন্দ—ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা ; পৃ. ১৩৮ ; স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা ; ৫ম খণ্ড।

অর্জন করেন তাতে ইংরেজের প্রতি ক্ষুব্ধ মনোভাব গ্রহণ না করে দেশবাসীর কাছে তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে এর প্রয়োজনীয়তার দিক্‌টি তুলে ধরেন। ভারতবাসীকে চিহ্নিতকরণের জন্য ইংরেজ-প্রদত্ত 'নেটিভ' সম্বোধনটি নিঃসন্দেহে ঘৃণাবাচক কিন্তু এই একটি শব্দ বিভেদকামী ভারতবাসীকে সমগ্রতাব মধ্যে আবদ্ধ করেছে। সেখানে ইংরেজ সরকার উচ্চ-নীচ, ছোট-বড় অথবা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রকে পৃথক্ পৃথক্ মর্যাদায় চিহ্নিত করেনি। সকল ভারতবাসীর প্রতি ইংরেজের এই সম্বোধন শ্রদ্ধাব্যঞ্জক না হওয়ায় বিবেকানন্দেব ভারতবাসী হিসেবে পরাধীনতার গ্লানি অনুভূত হয়েছে বটে কিন্তু অপমানিত দেশবাসীর এই ঘৃণার আঘাতে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের সম্ভাবনায় তাঁর চিত্তে বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে এবং সেই উদ্দীপনার উৎসমুখেই ভারতবাসীর প্রতি ইংরেজ সরকারের ঘৃণ্য সম্বোধনের প্রত্যুত্তরে সাধুবাদ জানিয়েছেন ঃ

> "তবে আমরা দেশে শুনি, আমাদের ভেতর অমুক ভদ্র জাত অমুক ছোট জাত। সরকারের কাছে সব নেটিভ। মহারাজা, রাজা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সব এক জাত—'নেটিভ'। কুলির আইন, কুলির যে পরীক্ষা, তা সকল 'নেটিভের' জন্য—ধন্য ইংরেজ সরকার।"

তাঁর বৈদান্তিক দৃষ্টিভঙ্গি সহজাত নিরাসক্তি ছিল বলেই অপমানে বিচারবোধ বিলুপ্ত হয়নি, স্বাভাবিক সর্তেই ঘটেছে আত্মানুসন্ধান ; আর তারই আলোকে দেখেছেন স্বজাতির হীনম্মন্যতা। জাতির সর্বস্তরে দুষ্ট ক্ষতের মতো যে বিভেদকামিতা আত্মপ্রকাশ করেছে সেই ক্ষতের উপশম ও আরোগ্যের জন্য লাঞ্ছনার এই অস্ত্রোপচারের কষ্টদায়ক চিকিৎসাকে সুপ্রযোজ্য বলেই তিনি মনে করেছেন। সংকীর্ণ জাত্যভিমানবশে যে ভারতবাসী সামাজিক ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে পক্ষপাতমূলক আচরণ করেছে, ইংরেজ সরকারের এক আইনের

ধাক্কায় তার পরিবর্তন ঘটেছে। 'ন্যায়াদর্শের সর্বভূমিনতা'[১] প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইংরেজ প্রবর্তিত নতুন আইন প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে। বিচারের ক্ষেত্রে সমতা সৃষ্টি করে শ্রেণীবিশেষের প্রতি বিশেষ সুযোগ দেবার অথবা দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করার প্রবণতা তিরোহিত হয়েছে ইংরেজ প্রবর্তিত ন্যায়দণ্ডের উপযুক্ত প্রয়োগে। ভারতবাসীকে অপমানজনক 'নেটিভ' সম্বোধনে অভিহিত করে ইংরেজ পরোক্ষভাবে ভারতবাসীর কল্যাণ সাধন করেছে বলেই বিবেকানন্দ মনে করেছেন। শ্রেণী-বৈষম্যে বিক্ষত জাতির উপর অপমানের প্রলেপ এনে দিয়েছে বিভেদ-বেদনা উপশমের সম্ভাবনা। ভারতবাসী ইংরেজের সংস্পর্শে আসার পূর্বে জাতিভেদজনিত দুগ্র্হের দ্বারা কি ভাবে আচ্ছন্ন ছিল তার স্বরূপ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমতটি প্রণিধানযোগ্য :

"তৎপূর্বে আমরা মেনে নিয়েছিলুম যে, জন্মগত নিত্যবিধানে বা পূর্বজন্মার্জিত কর্মফলে বিশেষ জাতের মানুষ আপন অধিকারের খর্বতা, আপন অসম্মান শিরোধার্য করে নিতে বাধ্য ; তার হীনতার লাঞ্ছনা কেবলমাত্র দৈবক্রমে ঘুচতে পারে জন্ম পরিবর্তনে। আজও আমাদের দেশে শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে বহু লোক রাষ্ট্রীয় অগৌরব দূর করার জন্যে আত্মচেষ্টা মানে, অথচ সমাজ বিধির দ্বারা অধঃকৃতদেরকে ধর্মের দোহাই দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে আত্মাবমাননা স্বীকার করতে বলে; এ কথা ভুলে যায় যে, ভাগ্যনির্দিষ্ট বিধানকে নির্বিরোধে মানবার মনোবৃত্তিই রাষ্ট্রিক পরাধীনতার শৃঙ্খলকে হাতে পায়ে এঁটে রাখবার কাজে সকলের চেয়ে প্রবল শক্তি।"[২]

জাতিভেদ সমস্যার সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে উচ্চতর সমাজের কাছে এর প্রতিক্রিয়ার একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যেটি তাঁর বক্তব্য বিশ্লেষণ করলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে— 'বিশেষ কায়স্থকুলে এ শরীরের পয়দা হওয়ায়, আমি ত চোরেব দায়ে

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—কালান্তর ; পৃ. ১৬।
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—কালান্তর ; পৃ. ১৭।

ধরা পড়েছি।' জাতিভেদের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দের মুখর সমালোচনার সূত্রে উচ্চতর সমাজের এরূপ ধারণা পোষণ করার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে যে, যেহেতু তিনি নিজে ব্রাহ্মণেতর কায়স্থকুলোদ্ভুত সেই হেতু তাঁর শ্রেণীবৈষম্য সম্পর্কিত মতামত আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক অথবা উচ্চবর্ণের প্রতি অসূয়াপ্রসূত। অন্যায়কারীর যে ছলের অভাব হয় না—এই অনিবার্য সত্যকেই স্মরণ করে বিবেকানন্দ নিজের সম্পর্কে সসংকোচ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

এই জাতিভেদ জনিত সংকীর্ণ চেতনার মূল কত গভীরে প্রথিত তার ক্লেদাক্ত স্বরূপও এই প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। বর্হির্ভারতবাসীর আর্যত্বের অভিমান ও ভারতবাসীর পরিপূর্ণ আর্যত্ব সম্পর্কে বিদেশীদের সংশয়-প্রকাশ তাঁর ভারতীয়ত্ববোধকে যে আহত করেছিল তাও প্রকাশ করতে তিনি কুণ্ঠিত হননি। দেশবাসীর মধ্যে শ্রেণী-বৈষম্য যেমন তাঁর কাছে অসহ্য মনে হয়েছে তেমনি বিদেশীদের পরিপূর্ণ আর্যত্বের দাবী ও ভারতীয়দের আর্যত্বকে নস্যাৎ করার প্রচেষ্টাও তাঁর কাছে অসহ্য বলে মনে হয়েছে। এই বিদেশীরা পরস্পরে অর্জিত আযত্বের পরিমাণ নির্ধারণ সম্পর্কে কিরূপ হাস্যকর বিতর্কে লিপ্ত তার একটি সূক্ষ্ম শ্লেষাত্মক পরিচয় দিয়েছেন:

> "এখন সকল জাতির মুখে শুনচি, তাঁরা নাকি পাকা আর্য্য। তবে পরস্পরের মধ্যে মতভেদ আছে,—কেউ চার পো আর্য্য, কেউ এক ছটাক কম, কেউ আধ কাঁচ্চা! তবে সকলেই আমাদের পোড়া জাতের চেয়ে বড়, এতে একবাক্য।"

বিবেকানন্দের পরিচ্ছন্ন চিত্ত-দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছে সামগ্রিক মানবচরিত্র এবং তারই নিরপেক্ষ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় তাঁর পর্যালোচনায়; সেখানে তিনি দেশবাসীর সংকীর্ণতাকে তীব্র বাক্যবাণে জর্জরিত করেছেন এবং ইংরেজের আত্মাভিমানের অসারতাকে প্রতিপন্ন করতেও কুণ্ঠিত হননি। দায়িত্ব-বিস্মৃত বর্ণ-

শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরা নিজেদের পরিপূর্ণ আর্যত্বের অধিকার প্রতিপন্ন করার জন্য ভারতবর্ষে তারা আগন্তুক হিসাবে পরিচয় দিয়ে ইংরেজের সঙ্গে সম মর্যাদা দাবী করে এবং অন্যান্য ভারতবাসী থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র বলে ঘোষণা করে। ইংরেজ যেমন তার ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী বিস্তারকে সভ্যতাবিস্তারের মহান্ দায়িত্ব পালনের আচ্ছাদন দিয়ে আচ্ছন্ন করতে চায় তেমনি ব্রাহ্মণ্য সমাজও তাদের ভারতবর্ষে অবস্থিতিকে দয়াপরবশ হয়ে আগমন বলে প্রচার করার চেষ্টা করে এবং তাদের প্রবর্তিত সংস্কার-মূলক আচার-অনুষ্ঠানগুলির অসাফল্য ও অগৌরবের দায়িত্বকে অস্বীকার করার জন্য ঐসব অনুষ্ঠানগুলির সঙ্গে নিজেদের সংযোগকে বর্তমানে মেনে নিতে রাজি নয় :

"আর শুনি, ওঁরা আর ইংরাজরা নাকি এক জাত, মাস্‌তুতো ভাই ; ওঁরা কালা আদ্‌মি নন্। এদেশে দয়া করে এসেচেন, ইংরাজের মত। আর বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, মূর্ত্তিপূজা, সতী-দাহ, জেনানা পর্‌দা ইত্যাদি ইত্যাদি ওসব ওঁদের ধর্মে আদৌ নাই। ওসব ঐ কায়েৎ ফায়েতের বাপ দাদা করেচে।"

ভারতবর্ষে শ্রেণীবিশেষের এই আর্যত্বের অভিমানকে তীব্র কটাক্ষ করে বিবেকানন্দ বলেছেন যে, অপরাপর ভারতবাসী থেকে স্পর্শ বাঁচিয়ে চললেও ইংরেজের কাছে স্বতন্ত্র কোন মর্যাদা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই —তা কেবল আত্মঅবমানারই নামান্তর হয়ে দাঁড়াবে। উনিশ শতকে পরানুকরণপ্রিয় ও পরপদলেহী এক শ্রেণীর ভারতবাসী পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচার-আচরণে দেশীয় সংস্কার ও ঐতিহ্য বর্জন করে ইংরেজের সান্নিধ্য অর্জনে ব্যাকুলতা প্রকাশ করতে থাকে এবং এই চিত্রটি সমকালীন ইতিহাস-সমর্থিত। বিবেকানন্দের স্বদেশ-প্রেমিক চিত্ত এই হীনম্মন্যতায় বিশেষ ভাবে আহত হয়েছিল এবং সেই আহত চিত্ত থেকে উত্থিত হয়েছে ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্যগুলি। কিন্তু এই ব্যঙ্গই তাঁর বক্তব্যের মূল কথা নয় ; তিনি দেশবাসীকে আত্ম-মর্যাদাসম্পন্ন করে তোলার জন্য ব্যঙ্গের এই নির্মম কশাঘাত বর্ষণ

করেছেন। দেশীয় সংস্কৃতি, সভ্যতা, আচার-আচরণকে পরিত্যাগ করে ইংরেজ সাজবার ভবিষ্যৎ পরিণাম কি হবে তাও স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন ঃ

> "দিশি কাপড় ছাড়লেই, দিশি চাল ছাড়লেই, ইংরেজ রাজা মাথায় কোরে নাকি নাচবে শুনেছিলুম, করতেও যাই আর কি, এমন সময় গোরা পায়ের সবুট লাথির হুড়োহুড়ি, চাবুকের সপাসপ,—পালা পালা, সাহেবিতে কাজ নেই, নেটিভ্ কব্‌লা। 'সাধ করে শিখেছিনু সাহেবানি কত, গোরার বুটের তলে সব হৈল হত।'

'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ'—এই আপ্তবাক্যের মতই বিবেকানন্দ বলেছেন, ইংরেজের শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক কিন্তু স্বদেশী আচার পরিত্যাগ করে ইংরেজের কাছে করুণাপ্রার্থী হলে লাঞ্ছনা ভোগ ব্যতীত সৌভাগ্য অর্জন সম্ভব নয়। সামান্য অন্ন-বস্ত্রে সন্তুষ্ট থাকবার জন্য তিনি দেশবাসীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

আমেরিকা মহাদেশে ধর্মমহাসম্মেলনে যোগদান করতে গিয়ে বিবেকানন্দ ভারতবাসী হিসাবে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেন তার একটি সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত এই সূত্রে উপস্থাপিত করেছেন। নাপিতের দোকানে দাড়ি কামাতে গিয়ে অপমানিত হয়ে তাঁকে ফিরতে হয়েছিল এই প্রত্যাখ্যানের কারণ, ভারতবাসী হওয়া যেন মার্কিনের দৃষ্টিতে অপরাধ। এই পরিস্থিতিতে পড়ে স্বাভাবিক কারণেই তাঁর বিচার-বিভ্রম ঘটেছিল। তিনি অনুমান করেন যে ইংরেজী পোশাকের পরিবর্তে সন্ন্যাসীর পোশাক পরিধানের জন্যই বোধ হয় প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন, তাই পোশাক পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু কোন বিশিষ্ট মার্কিনের পরামর্শে তাঁর জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হয় এবং অপরের উপর নির্ভরতা পরিত্যাগ করেন। আহার্য সংগ্রহের জন্য খাবারের দোকানে গিয়েও অনুরূপ ভাবে প্রত্যাখ্যাত হন এবং সেখানে প্রত্যাখ্যানের কারণ অনুসন্ধান করে জানলেন যে, তাঁর সঙ্গে এক

আসনে বসে কোন মার্কিন আহার্য গ্রহণ করলে তার জাতিচ্যুত হবার আশঙ্কা আছে। এই অপমান ও লাঞ্ছনা সত্ত্বেও এদের জাত্যভিমানকে মনে মনে অভিনন্দন জানান এবং স্বদেশের শ্রেণী-বৈষম্যজনিত নগ্ন বিভেদপ্রবণতাকে ধিক্কার জানান। বিদেশীর সান্নিধ্য অর্জনের প্রতিযোগিতা থেকেই ভারতবাসীর মধ্যে আর্যত্বের পরিমাণ নিয়ে পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি এবং সেই দ্বন্দ্বের কি করুণ পরিণতি তাকেই নিজের মার্কিন দেশ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত করেছেন। বিবেকানন্দ ভারতবাসীর শ্রেণীবিশেষের ইংরেজের সান্নিধ্য লাভের জন্য লোলুপতা প্রকাশ ও ইংরেজের প্রতি প্রশংসামুখর আলোচনা এবং ভারতবর্ষের রীতি-নীতি ও ধর্মাদর্শের বিরুদ্ধে অশোভন মন্তব্য প্রকাশ প্রভৃতি লক্ষ্য করে তীব্র অন্তর্বেদনা অনুভব করেন এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে এই শ্রেণীবিশেষের প্রতি মর্মান্তিক আঘাত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শ্লেষাত্মক অভিমত প্রকাশ করেন :

> "যদি না পছন্দ হয়, সরে পড় না কেন ? তোমাদের দু-চারজনের জন্য দেশশুদ্ধ লোককে হাড়-জ্বালাতন হ'তে হবে বুঝি ? চরে খাওগে না কেন ? এত বড় দুনিয়াটা পড়ে তো রয়েছে। তা নয়। মুরদ কোথায় ? ঐ বুড়ো শিবের অন্ন খাবেন, আর নিমকহারামি করবেন, যীশুর জয় গাইবেন—আ মরি !! ঐ যে সাহেবের কাছে নাকি-কান্না ধর যে, 'আমরা অতি নীচ, আমরা অতি অপদার্থ, আমাদেন সব খারাপ,' এ কথা ঠিক হতে পারে—তোমরা অবশ্য সত্যবাদী ; তবে ঐ 'আমরা'র ভেতর দেশসুদ্ধকে জড়াও কেন ? ওটা কোন্ দিশি ভদ্রতা হে বাপু ?"[১]

আর্যত্বের অহংকারে যারা ভারতের সাধারণ অধিবাসীর সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করে এবং বিদেশীর সঙ্গে সম্পর্কের নৈকট্যের দাবী জানায়

১. স্বামী বিবেকানন্দ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ; পৃ. ৬।

তাদের সেই ধারণা কত ভ্রান্ত ও স্বজাতিদ্রোহিতামূলক তা' নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হয় সমগ্র ভারতবাসীর প্রতি ইংরেজের 'নেটিভ' সম্বোধনের মধ্য দিয়ে। এদের গৌরবের ঢাক এরা নিজেরাই বাজায়, কিন্তু তাদের স্বীকৃতি না আছে দেশবাসীর কাছে না আছে বিদেশীর কাছে। ভারতবর্ষের শ্রেণীবিশেষের এই ভ্রান্ত অহমিকাকে বিবেকানন্দ একটি প্রাসঙ্গিক গল্পের মধ্য দিয়ে সরস বাক্যবাণের দ্বারা বিদ্ধ করেছেন :

"একটা ডোম বল্‌ত, 'আমাদের চেয়ে বড় জাত কি আর ছুনিয়ায় আছে? আমরা হচ্ছি ডম্‌ম্‌ম্‌!' কিন্তু মজাটি দেখেচ? জাতের বেশী বিট্‌লামিগুলো—যেখানে গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল সেইখানে!"

॥ ২ ॥

সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতের উচ্চতর জীবন-চিন্তা থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরে উচ্চবর্ণের আধিপত্য প্রবল প্রতাপের সঙ্গে পরিচালিত হয়ে আসছে। জ্ঞান-ভাণ্ডার যেমন এদের করায়ত্ত তেমনি সুখ-সমৃদ্ধির পরিপূর্ণ অধিকারে এদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য অপ্রতিহত গতিতে চলে আসছে। কিন্তু উচ্চবর্ণের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সম্পদের সৌধ রচনায় লোকচক্ষুর অন্তরালে যাদের কঠোর কায়িক শ্রম ও আত্মত্যাগ বিদ্যমান তারা সামান্য স্বীকৃতি ত' দূরের কথা সামাজিক মর্যাদাটুকু পর্যন্ত পায়নি। কর্তব্যপালনের দায়িত্ব এই অধঃস্তন সমাজের মানুষ মূক পশুর মত বহন করে চলেছে এবং এদের কৃতকর্মের উপর কীর্তির পতাকা উড্ডীন করেছে উচ্চ সম্প্রদায়ভুক্ত সমাজের মানুষ, আর সামাজিক ও ধর্মীয় বিধি-নিষেধের শৃঙ্খলে এদের জীবনের স্বচ্ছন্দ গতি পদে পদে নিয়ন্ত্রিত—সুখ এদের কাছে স্বপ্নবৎ অলীক এবং বঞ্চনা ও অসম্মান এদের শিরোভূষণ। 'পরিব্রাজক' রচনার অনেক পরে ১৯৩০ সালে 'রাশিয়ার চিঠি' নামক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বঞ্চিত সমাজের প্রকৃত অবস্থাকে বর্ণনা করেছেন :

> "চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশী, তারাই বাহন ; তাদের মানুষ হবার সময় নেই ; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সবচেয়ে কম খেয়ে কম প'রে কম শিখে বাকি সকলের পরিচর্যা করে ; সকলের চেয়ে বেশী তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা উপোসে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি-ঝাঁটা খেয়ে মরে—জীবনযাত্রার জন্য যত কিছু সুযোগ-সুবিধে সব কিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার

পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে—উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে"।[১]

একদিকে লক, হিউম, হার্বার্ট স্পেনসার প্রমুখের পাশ্চাত্য মানববাদী দর্শন-চিন্তা, অপর দিকে শ্রীরামকৃষ্ণের 'শিবজ্ঞানে জীবসেবার বৈদান্তিক আদর্শে দীক্ষিত স্বামী বিবেকানন্দ: উনিশ শতকে ভারতবর্ষে গণচেতনা সৃষ্টির আহ্বান জানালেন। তাঁর এই আহ্বানের সুরে সমাজতন্ত্রের প্রতিধ্বনি অনিবার্য ভাবেই শোনা যায়, কিন্তু সেই সমাজতান্ত্রিক, সুরটির মাত্রা বিচার করলে তাঁর উপলব্ধ সমাজতান্ত্রিক চেতনার স্বরূপগত বৈলক্ষণ্য স্পষ্ট হবে।

আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদ সর্বস্তরে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী। জীবনধারণের প্রয়োজনে অর্থ-খাদ্য-বস্ত্র উৎপাদন ও বণ্টনে ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী নির্বিশেষে সকল মানুষের সমান অধিকার-নীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে অসন্তোষ দূরীভূত হয়ে যথার্থ সাম্য ও মৈত্রীপূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি হতে পারে। বিবেকানন্দও এই সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে নিম্নবর্ণের উপর উচ্চবর্ণের প্রভুত্ব অথবা সমষ্টির প্রতি ব্যষ্টির কর্তৃত্ব ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে উত্তেজনা সঞ্চার না করে যুক্তি ও বিচারের পথে জনচেতনা জাগ্রত করে এই অভিশাপের আশু অবসান কামনা করেন এবং নিজের অধিকার সম্পর্কে যারা সচেতন নয় তাদের মধ্যে চেতনাবোধ জাগ্রত করার জন্য আহ্বান জানান। স্বামীজী মার্কসের সাম্যাদর্শের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু এর অর্থনৈতিক মতবাদ বিজ্ঞানসম্মত হলেও দার্শনিক ভিত্তি নিছক জড়বাদমূলক হওয়ায় বিবেকানন্দ এই মতবাদকে সম্পূর্ণতঃ গ্রহণ করতে পারেননি। বিবেকানন্দ অর্থনীতি সমেত মানব-জীবনের সর্বস্তরে, এমনকি প্রাত্যহিক জীবনে সাম্যাদর্শকে অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বেদান্ত-দর্শনের মধ্যেই সাম্যাদর্শের এই চরম বিস্তার লক্ষ্য করেছেন: 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু'

---

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—রাশিয়ার চিঠি; পৃ. ১।

অর্থাৎ নিজের মত সকলকে দেখা অথবা 'সমতা সর্বভূতেষু এতন্মুক্তস্য লক্ষণম্'—সর্বভূতে সমতা বা সমদর্শনই মুক্তির লক্ষণ। মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয় কেবল দেশ-কালগত নয়, আত্মার দিক্ থেকে সকল মানুষ এক ও অভেদ। বিবেকানন্দ এই বৈদান্তিক দর্শনের সুদৃঢ় যুক্তির উপর নিজের সাম্যচেতনা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং এই সমাজতন্ত্রবাদের বিকৃতি কোন কালেই ঘটতে পারে না। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সোস্যালিজমের বিকৃতি বার বার ঘটেছে এবং এ সম্পর্কে সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর অভিমতটি প্রণিধানযোগ্য :

> "সোস্যালিজমের মূল প্রেরণা কি? সোস্যালিষ্ট আদর্শের সার্বজনীন মানবিক আবেদনটি ঠিক কোনখানে? রুশ সোস্যালিষ্ট সমাজের ইতিহাস থেকে সোস্যালিষ্ট মতবাদ ও কর্মধারার যে বিকৃতি প্রত্যক্ষ হয়েছে এবং চীনের আসুরিক সমাজতন্ত্রের নগ্নরূপ সম্প্রতি যেভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, তাতে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষমাত্রেরই সোস্যালিজম সম্পর্কে নতুন জিজ্ঞাসা দেখা দিয়েছে। এই জিজ্ঞাসা ও সংশয় সত্যপ্রাপ্তির পথ বলেই আমরা মনে করি। এবং ঠিক সেইজন্য সোস্যালিষ্ট কূপমণ্ডুকতা ও ধর্মান্ধতাকে আমরা পরিহার করতে চাই। যুক্তি ও বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, মানবিক সৌভ্রাত্রে অনুপ্রাণিত, শোষণহীন যে সমাজের কল্পনা সোস্যালিষ্ট চিন্তানায়কেরা করেছিলেন, মানব-মুক্তিই ছিল তার প্রধান কথা। বিবেকানন্দও মানবমুক্তির প্রশ্নেই সোস্যালিষ্ট হয়েছিলেন।"[১]

বিবেকানন্দের এই বিশিষ্ট সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা থেকেই অতীত সংস্কারাচ্ছন্ন ভারতের তথাকথিত আত্মসন্তুষ্ট উচ্চবর্ণ সম্পর্কে কটাক্ষবাণ বর্ষিত হয়েছে। সংস্কারের লূতাতন্তু বিস্তার করে আত্মগৌরবে বিভোর হয়ে এই উচ্চবর্ণের ভারতবাসীরা নিজেদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এদের জীবনের মধ্যে তিনি কোথাও সজীবতার লক্ষণ

---

১. সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—বিবেকানন্দ ও সোস্যালিজম্; বিশ্ববিবেক, পৃ. ২৯৫।

দেখতে পাননি। চিন্তার যেখানে স্থবিরতা ঘটে, বিচারবোধ যেখানে বিলুপ্ত হয়, দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যেখানে উদারতা নেই, যুগের দাবী যেখানে অস্বীকৃত, সেখানে বেঁচে থাকা মৃত্যুরই নামান্তর। নিজেদের গৌরব প্রচার করার জন্য এই উচ্চবর্ণের মানুষগুলি কেবল আর্যত্বের অভিমান ও পূর্বপুরুষের কীর্তি-কথাকে শেষ সম্বল হিসেবে সরবে প্রচার করে। জীবনে এদের না আছে উদ্যম, এরা না শোনায় অপর বর্ণের উদ্দেশ্যে কোন আশ্বাসের প্রতিশ্রুতি। বিবেকানন্দ বোঝা-স্বরূপ এই জীবনে প্রাণের অস্তিত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দিহান :

> "আর্য্যবাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিন রাতই কর, আর যতই কেন তোমরা 'ডম্‌ম্‌' বলে ডম্ফই কর, তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্ছ দশ হাজার বচ্ছরের মমি!!"

'মূক যারা দুঃখ-সুখে, নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে'—নিম্ন-বর্ণের সেই নম্র-নত মানুষেরা উচ্চবর্ণের কাছে পেয়েছে ঘৃণা, অপমান ও লাঞ্ছনা এবং এদের অস্তিত্ব 'চলমান শ্মশান' বলে অস্বীকৃত হয়েছে। কার্যত: এই উচ্চবর্ণেরা নিজেদের চিন্তা-চেতনা, মনন ও মানসের স্থবিরতাকে গোপন করার জন্য অপরের প্রতি বিরূপতা প্রকাশ ও বিদ্বেষ বর্ষণকেই আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছে। নিজেদের অস্তিত্বের প্রমাণ যেখানে প্রশ্নাতীত নয় সেখানে অপরের প্রতি বিরূপতা প্রকাশ অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়; বিশেষতঃ যেখানে উচ্চবর্ণেরা সংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে চলমান জীবন ও জগতকে অস্বীকার করে কূপমণ্ডুকের মত জীবনযাপনে অভ্যস্থ সেখানে নিম্ন-বর্ণের মধ্যে প্রাণের এই স্ফূর্তি, কর্মের উদ্যম, আশা ও উৎসাহের ব্যাপকতা লক্ষ্য করে আশংকাজনক পরিণতি থেকে পরিত্রাণের জন্য ঘৃণার প্রাচীর তুলে উচ্চবর্ণেরা এদের অগ্রগতিকে প্রতিহত করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট। বিবেকানন্দ উচ্চবর্ণের প্রাচীন প্রথাসিদ্ধ রক্ষণশীল জীবনযাপনকে স্মৃতি-সংরক্ষণশালা বা মিউজিয়ামের সঙ্গে তুলনা

করেছেন। আর্যসভ্যতা-প্রসূত উচ্চবর্ণের জীবন-ব্যবস্থা, নগর-সভ্যতা, স্থাপত্য-কীর্তি প্রভৃতি প্রাচীনতারই অনুসারী, তার মধ্যে না আছে সংযোজন, না আছে পরিবর্তন অথবা পরিমার্জনের কোন প্রচেষ্টা। রূপকথার প্রাচীনতা যেমন অমলিন এবং অবিকৃত ভাবে যুগ থেকে যুগান্তরে, কাল থেকে কালান্তরে প্রসূত তেমনি উচ্চবর্ণের ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ সুপ্রাচীন কাল থেকে সমস্ত পরিবর্তনকে অস্বীকার করে কোন রকমে আপন অস্তিত্বকে টিঁকিয়ে রেখেছে। বেঁচে থাকার লক্ষণ এটা নয়, কোন রকমে টিঁকে থাকা :

> "তোমাদের সঙ্গে আলাপ করে ও ঘরে এসে মনে হয়, যেন চিত্র-শালিকায় ছবি দেখে এলুম। এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরু মরীচিকা, তোমরা—ভারতের উচ্চ বর্ণেরা।"•

উচ্চবর্ণের মানুষের চিন্তা-চেতনা ও কার্যক্রমের মধ্যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কোন স্পষ্ট বিভাজন করা দুঃসাধ্য ; কারণ গতানুগতিকতার কোন পরিচ্ছেদ বা অধ্যায় থাকে না—যাকে কালের সংজ্ঞায় চিহ্নিত করা যায়। এই নিষ্প্রাণ জড়বৎ জীবনা-চরণের আশু অবসান কামনা করেছেন বিবেকানন্দ এবং প্রাচীন-পন্থীদের সম্বোধন করে দেশের আত্মশাসনের ভার এই নিম্নবর্ণের হাতে তুলে দিতে বলেছেন—কর্তব্যে যারা কঠোর,প্রত্যয়ে যারা স্থির-নিষ্ঠ, আশা ও আশ্বাসে যাদের অন্তর ভরপুর,নব-সৃষ্টির আগ্রহে যারা উদ্দাম, শক্তি-বীর্যে-সাহসে যারা নৈষ্ঠিক সৈনিক তারাই হবে ভবিষ্যৎ ভারতের রূপকার। বিবেকানন্দের এই আহ্বানের ভাষায় সংঘাত-সংঘর্ষ সৃষ্টির কোন অশুভ প্রচেষ্টা নেই, আছে স্বরূপ উপলব্ধির আবেদন। সংকীর্ণ স্বার্থচেতনার বাইরে মানবতার যে উদার বাতায়ন আছে, সেখানে উচ্চবর্ণের মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন নিম্নবর্ণের মানুষের কাছে ক্ষমতা ও অধিকার হস্তান্তরিত করে দেবার জন্য—এখানেই তাঁর মানববাদী সমাজতন্ত্রের বিশিষ্টতা।

ভারতবর্ষে ইংরেজ-আমলে 'জ্ঞানের বিশ্বরূপ'[১] দর্শনের যে সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল বিবেকানন্দ সংরক্ষণশীল প্রাচীনপন্থীদের কুক্ষিগত জ্ঞান ও বিদ্যার সমৃদ্ধ ভাণ্ডার নবীন নবজাতকদের হাতে তুলে দিয়ে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার প্রস্তাব রাখেন। ডঃ হরপ্রসাদ মিত্রের একটি বক্তব্যের সংযোজনা এই প্রসঙ্গে অপরিহার্য :

"লোকসাধারণের এই অধিকার প্রচারে তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পূর্বগামী। বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকশিক্ষা' প্রবন্ধের কথা মনে পড়ে। সমাজ-চিন্তায় তাঁর প্রগতিবাদ বঙ্কিমচন্দ্রেরই সন্নিহিত।"[২]

ভারতবর্ষে সর্বসাধারণের কাছে শাস্ত্র-স্মৃতি চর্চার অবাধ স্বাধীনতা ইংরেজ আগমনের পূর্বে ছিল না, কিন্তু ইংরেজের আমলে গণশিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সেই নিষেধাজ্ঞা স্বাভাবিক সর্তেই প্রত্যাহৃত হয়েছে এবং সেই সূত্রে বিবেকানন্দ উচ্চবর্ণের কবলিত জ্ঞানালোক নিম্নবর্ণের কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। সংঘর্ষের দ্বারা সমাধান সম্ভব নয়—এই প্রত্যয় থেকেই বিবেকানন্দ জ্ঞানচর্চার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। নিম্নবর্ণের প্রতিষ্ঠা অর্থে সভ্যতা-সংস্কৃতির বিনাশ-সাধন নয়; তাকে অব্যাহত রাখবার জন্যই নিম্নবর্ণের সপক্ষে উচ্চবর্ণের কাছে জ্ঞান-বিদ্যার অধিকার দাবী করেছেন। কার্ল-মার্কস শোষিতশ্রেণীর প্রতিষ্ঠা ও এই শ্রেণী-সংঘর্ষের ফলে সকল কিছুর উচ্ছেদের বার্তাই ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু স্বামীজী এখানে সমন্বয়-বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে নিম্নবর্ণকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।

যারা উচ্চবর্ণের কাছে ব্রাত্য, অনাদৃত, অবহেলিত হিসাবে চিহ্নিত সেই নিম্নশ্রেণীর মানুষকে নবভারত গঠনের কর্মযজ্ঞে আহ্বান জানিয়েছেন :

---

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—কালান্তর ; পৃ. ১৪।

২. হরপ্রসাদ মিত্র—বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সমাজচিন্তা ; পৃ. ২২।

"বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপ্ড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনা-ওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড়, পর্বত থেকে।"

সর্বস্তরের মানুষ যেদিন শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত হবে এবং ন্যায্য মর্যাদা পাবে সে দিনই ভারতের পুনর্গঠন সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করেছেন। ইংরেজ প্রবর্তিত আধুনিক যুগ প্রতিযোগিতা ও প্রতি-দ্বন্দ্বিতার যুগ—সংঘশক্তি ব্যতীত এযুগে সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়। সুতরাং অবহেলা, অনাদরে যারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে তাদের যুগ-প্রয়োজনেই গ্রহণ করতে হবে। এই নিম্নশ্রেণীর মানুষের শ্রম-ই একমাত্র সম্বল এবং দেশে দেশে যুগে যুগে এই শ্রমজীবীদের শ্রমের উপরেই গড়ে উঠেছে সভ্যতার সৌধ। 'সুয়েজ খাল' প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সঙ্গতভাবেই ভারতের সঙ্গে ইউরোপের যোগাযোগ এবং ভারতীয় শ্রমজীবীদের পরিশ্রমোৎপন্ন পণ্যে ইউরোপ ও দূর প্রাচ্যের সমৃদ্ধির কথা তাঁর মনে পড়ে গেছে এবং ভারতের এই শ্রমজীবীদের অবহেলিত জীবনের জন্য মমতায় তাঁর অন্তর বিগলিত হয়েছে। পরাধীনতার শৃঙ্খলে সমগ্র দেশবাসীর মত তারাও আবদ্ধ হয়েছে এবং লাঞ্ছনা সমানভাবে ভোগ করেছে, কিন্তু এদের ভাগ্যে সেই সঙ্গে জুটেছে স্বজাতির নিন্দা, অবহেলা। অথচ দেশের এবং বিদেশের প্রভুত্বকামী মানুষ এদের পরিশ্রমের ফসলেই নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে পরিপুষ্ট করেছে:

"হে ভারতের শ্রমজীবী! তোমার নীরব, অনবরত নিন্দিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বাবিল, ইরাণ, আলকসন্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভিনিস, জেনোয়া, বোগদাদ, সমরকন্দ, স্পেন পর্তুগাল ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য।"

প্রসঙ্গতঃ ভারতের উচ্চবর্ণের মানুষের হৃদয়হীনতা ও গৌরবের কৃত্রিম

আস্ফালন সম্পর্কে তাঁর ধিক্কার ও শ্রমজীবীদের উদ্দেশে তাঁর অন্তর-মথিত সমবেদনার উৎসধারা উন্মুক্ত হয়েছে। উচ্চবর্ণের আত্মপ্রশংসা ও গৌরব প্রকাশের স্থূল যুক্তিগুলি সম্পর্কে বলেছেন যে, কাব্যগ্রন্থ ও পুরাতন মন্দির প্রভৃতি পূর্বপুরুষকৃত প্রাচীন কীর্তিকে অবলম্বন করেই এরা আত্মপ্রসাদ লাভ করে, বর্তমানের গৌরব এদের কিছুই নেই। কিন্তু যারা 'অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি ও নির্ভিক কার্যকারিতা' নিয়ে খ্যাতি-অখ্যাতির উধ্বে' অবস্থান করে সভ্যতার সোপানে আরোহণের পথকে আবিলতা মুক্ত, মসৃণ ও মনোরম করে তুলেছে তাদের কথা কেউ স্মরণ করে না। পুরস্কার ও প্রশংসার বিনিময়ে নিতান্ত অক্ষম মানুষও অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাতে পারে কিন্তু ভারতের এই শ্রমজীবীরা লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে নিঃস্বার্থ ভাবে অসীম কর্তব্যপরায়ণতার সঙ্গে 'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়' কাজ করে চলেছে। দুঃখকে এরা শিরোভূষণ করে অত্যাচার, অবহেলাকে অস্বীকার করে নিজেদের জীবনীশক্তিকে অটুটভাবে রক্ষা করেছে। অল্পেই এদের তৃপ্তি; নির্বিঘ্ন শান্ত প্রীতিমুগ্ধ জীবন এদের পরিচয়। জীর্ণ-অবসন্ন ভারতের বুকে নব জীবননারায়ণের ভগীরথ ডেকে আনবে এই শ্রমজীবী সম্প্রদায়। আগামী ভারতবর্ষের সম্ভাবনা সুপ্ত হয়ে আছে এদের জীবনের অন্তঃশীলায়। তাই স্বামীজী নিম্নবর্ণের সমাজকে অর্গলমুক্ত করে দেবার জন্য উচ্চবর্ণের মানুষের কাছে আর একবার আবেদন জানিয়েছেন:

> "অতীতের কঙ্কালচয়—এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্নপেটিকা, তোমার মাণিকের আংটি, ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও; আর তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কান খাড়া রেখো; তোমার যাই বিলীন হওয়া, অমনি শুনবে কোটি-জীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্যকম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন ধ্বনি 'ওয়াহ্ গুরু কি ফতে।'"

এই শ্রমজীবী নিম্নশ্রেণীভুক্ত মানুষের শক্তি-সামর্থ্য, সহনশীলতা, নম্রতা, প্রীতিবোধ, ভালবাসা প্রভৃতি মানবিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে যেমন উচ্চবর্ণের কাছে এদের জ্ঞানের অধিকার দানের দাবী জানিয়েছেন, তেমনি 'ইতালি' প্রসঙ্গে বর্ণনা দিতে গিয়ে এদের কীর্তিকথার বাস্তব উদাহরণ দিয়ে যোগ্যতাকে সপ্রমাণ করেছেন। ইউরোপের আধুনিক সভ্যতার বিস্তার মুগ্ধ-বিস্ময়ে বিবেকানন্দ দেখেছেন, কিন্তু বিস্ময়ে বিহ্বল না হয়ে এই মহান্ সৃষ্টির পশ্চাতে স্রষ্টার যে ভূমিকা আছে তাকেই লোকচক্ষুর অন্তরাল থেকে প্রকাশ্য জনারণ্যে সসম্মানে হাজির করেছেন। এই আধুনিক সভ্যতার যারা রূপকার তারা অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীভুক্ত এবং তাদের মধ্যে শিক্ষার সঞ্চার হওয়ায় ইউরোপে ক্রমশঃ সভ্যতার অগ্রগতি ঘটেছে। আমেরিকার উদাহরণ দিয়ে স্বামীজী তাঁর বক্তব্যকে আরও সত্যনিষ্ঠ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইউরোপের মূল ভূ-খণ্ড থেকে বহু দূরবর্তী আমেরিকা মহাদেশে নিম্নবর্ণের বহু দরিদ্রকে কৃতদাস হিসাবে পাঠান হত এবং এদের অক্লান্ত পরিশ্রমেই আধুনিক আমেরিকা মহাদেশ গড়ে ওঠে। বিবেকানন্দের এই বক্তব্যের পশ্চাতে ইতিহাসের যথেষ্ট সমর্থন আছে।

এতদিন নিম্নবর্ণের মানুষ যে অনাদর-অবহেলা পেয়ে এসেছে, তাদের দাবীকে যেমন তিনি বলিষ্ঠ ভাষায় উচ্চবর্ণের কাছে তুলে ধরেছেন তেমনি তাদের মনের শক্তি এই অনাদরের ধুলায় যাতে মলিন হয়ে না যায় তার জন্য এই শ্রেণীর মানুষদের অন্তরে উৎসাহ ও প্রেরণা সঞ্চারের চেষ্টা করেছেন :

> "বড়মানুষ, পণ্ডিত, ধনী এরা শুনলে বা না-শুনলে, বুঝলে বা না বুঝলে তোমাদের গাল দিলে বা প্রশংসা করলে কিছুই এসে যায় না; এঁরা হচ্ছেন শোভামাত্র, দেশের বাহার।"

দরিদ্র নিম্নবর্ণের প্রাণে আস্থাবোধ সঞ্চারের জন্য তিনি এদের

উদ্দেশে চিরকালীন সত্যকে পুনরুচ্চারিত করেছেন। সংখ্যাবল, ধন অথবা দারিদ্র্যই জীবনীশক্তি প্রকাশের একমাত্র সর্ত নয়, অল্প সংখ্যক মানুষও অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারে; যদি তারা কায়-মন-বাক্যে এক হয়। কর্মের পথে বাধা আসতে পারে এবং সেই বাধা থাকলেই কর্ম-শক্তি তাকে অতিক্রম করার জন্য দুর্বার হয়ে ওঠে। চিরকাল নতুনের অভ্যুদয় ঘটেছে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে এবং প্রাচীনের অস্বীকৃতির মধ্য দিয়ে; বাধার অন্তরালেই থাকে সাফল্যের সোপান—যেমন, অন্ধকারের কারা-প্রাচীরের অন্তরালেই থাকে আলোর ঝর্ণাধারা।

৫

॥ নিসর্গচেতনা ও সৌন্দর্য-প্রীতি ॥

'পরিব্রাজক' গ্রন্থে বিবেকানন্দের মুখ্য প্রস্তাবনা হল পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের কাছে উক্ত পত্রিকায় প্রকাশার্থ জলপথে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে জুন দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য পরিভ্রমণের ধারাবাহিক বর্ণনাজ্ঞাপক পত্র পাঠানো। গ্রন্থারম্ভে সেই প্রতিশ্রুতির সমর্থন পাওয়া যায়—"আজ সাতদিন হল আমাদের জাহাজ চলছে, রোজই তোমায় কি হচ্ছে না হচ্ছে খবরটা লিখ্‌বো মনে করি, খাতা পত্র কাগজ কলমও যথেষ্ট দিয়েচ, কিন্তু বাঙালী 'কিন্তু বড়ই গোল বাধায়'।" বাঙালীর সহজাত চরিত্রবৈশিষ্ট্য এই 'কিন্তু'-বাচক শব্দে পরিস্ফুট অলসতা যেমন তাঁর প্রতিশ্রুতি পালনে দীর্ঘসূত্রতা সৃষ্টি করেছে তেমনি বাঙালী-চরিত্রের গৌরবজনক বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সৌন্দর্যমুগ্ধ কবিদৃষ্টি ও অনিবার্য ভাবে জন্মসূত্রে লাভ করেছিলেন। সেই সৌন্দর্যমুগ্ধ চোখ মেলে শিশুর লোলুপতা নিয়ে তিনি যাত্রাপথের দুইধারে প্রসারিত শ্যামশষ্পাচ্ছাদিত বাঙলার অবারিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে আর একবারের মত দেখেছেন। আর কয়েক দিনের মধ্যেই সমগ্র বাঙলাদেশ তাঁর কাছে একটি স্মৃতিতে পর্যবসিত হবে। তাই নিত্যকার দেখার সঙ্গে এ দেখার একটি বিশেষ পার্থক্য আছে। তাঁর গৈরিক বসনাবৃত কর্তব্যকঠোর বলিষ্ঠ চরিত্রের মধ্যে যে রূপমুগ্ধ রূপশিল্পী ছিল তারই আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এই বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশে। স্বদেশের প্রতি আত্যন্তিক মমত্বের উৎসমুখে প্রত্যহের পরিচিত বাঙলার নিসর্গ-সৌন্দর্য যেমন অলৌকিক রসাবেশে অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠেছে, তেমনি আবেগধর্মী বর্ণনায় প্রকৃতির ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত

অনাবৃত তুচ্ছতা এক সমগ্রতায় ঢাকা পড়ে গেছে। কিন্তু 'শ্যামাচরণ' শ্রেণীর কবি-সাহিত্যকরা বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাবকে যে শৌখিন মজতুরির আশ্রয়ে পূরণ করার চেষ্টা করে তার প্রতি তিনি স্পষ্ট কটাক্ষ প্রদর্শন করেছেন এবং সেই সঙ্গে ভঙ্গী-সর্বস্ব রচনা-কৌশল পরিহার করে দূর পাল্লার ভ্রমণ-বর্ণনায় বাস্তবতার স্বাদ সাধ্যানুসারে বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। বাঙলাদেশের বর্ণনায় রোমান্টিক রসদৃষ্টি নিয়ে কবিত্বসুলভ ক্লাসিক বৈভব দান করেছেন :

> "এই অনন্তশস্যশ্যামলা সহস্রস্রোতস্বতীমাল্যধারিণী বাঙ্গালা দেশের একটি রূপ আছে। সেই রূপ কিছু আছে মলয়ালমে (মালাবার), আর কিছু কাশ্মীরে।"

নদীবিধৌত শ্যামবঙ্গের এই সামগ্রিক রূপ যেমন তাঁর মুগ্ধদৃষ্টির কাছে ধরা পড়েছে তেমনি রূপমুগ্ধ রূপশিল্পীর মত অপরূপ মাধুর্যে তাকে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন। 'সবার মাঝে সকল দেশের সেরা' বাঙলার এই নিসর্গ সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য বিবেকানন্দ তুলনামূলক বর্ণনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। বাঙলাদেশের প্রতি মমত্বের গভীরতাবশতঃ, বর্ষণমুখর গ্রাম-বাঙলার রূপ তাঁর সৌন্দর্যমুগ্ধ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। কচুপাতার উপর অজস্র মুক্তারাশির মত বৃষ্টি সম্পাত অথবা ধারাবর্ষণে অবনত তাল-নারিকেল খেজুরের পাতার যে শোভা এবং বর্ষণসিক্ত ভেকের উল্লাস-ধ্বনিতে মুখরিত গ্রাম্য-প্রকৃতি তাঁর কবিত্বসুলভ বর্ণনাকুশলতায় এক অপূর্ব শিল্পশ্রী মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'চিত্রশরৎ' কবিতার বর্ষণমুখর গ্রাম-বাঙলার সৌন্দর্যময় চিত্ররূপ এই প্রসঙ্গে আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে :

> তাল-বাকলের রেখায় রেখায় গড়িয়ে পড়ে জলের ধারা,
> সুর-বাহারের পর্দা দিয়ে গড়ায় তরল সুরের পারা ![১]

কোথায় গেল তাঁর সেই সত্য-সন্ধানী গভীর দার্শনিক দৃষ্টি,

---

১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—বেণু ও বীণা (১৯০৬)।

পরপদ দলিত দেশবাসীর সর্বাঙ্গীণ মুক্তিকামনা, নিত্যশুদ্ধ মানবাত্মার জাগরণ ঘটানো তাঁর সুপ্ত কবিচেতনা সামান্য সুযোগেই এই ভাবে উল্লসিত হয়েছে বারে বারে। নিত্যপরিচিত গ্রাম-বাঙলা তাঁর কর্মমুখর জীবনে যে আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়নি, প্রাত্যহিকতার মধ্যেও যে অনাস্বাদিতপূর্ব রূপ আছে, আজ আবার দেশ ছেড়ে বিদেশের পথে পা বাড়াবার পূর্ব মুহূর্তে সেই রূপসী বাঙলা অনাবৃত দেহ নিয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হয়েছে। মায়াময় রূপ ক্ষণিকের জন্য তাঁকে সব কাজ ভুলিয়ে তাঁর দৃষ্টিকে কেড়ে নিয়েছে। শহর পরিবেষ্টিত ক্ষীণস্রোতা গঙ্গার যে অপরূপ সৌন্দর্য আছে উদার উন্মুক্ত প্রকৃতির প্রান্তরে ডায়মণ্ড হারবারের কাছে তা' স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে খণ্ড ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্নতা সৌন্দর্যের সমগ্রতাকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে ; তাই সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে হলে প্রবেশ-পথে দূর থেকে দেখাই শ্রেয়। গঙ্গার প্রবেশমুখর এই ডায়মণ্ড হারবারকেই তাই গঙ্গার প্রকৃত সৌন্দর্য উপভোগের জন্য বিবেকানন্দ নির্বাচন করেছেন। দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তরের উপ চন্দ্রাতপের মত সুনীল আকাশ দিগ্‌বলয়কে স্পর্শ করেছে, তার বক্ষে লীলাচঞ্চল বিচিত্রবর্ণ মেঘের আনাগোনা এবং নীল গগনের নীচে মৃদুমন্দ বাতাসে আন্দোলিত শ্রেণীবদ্ধ তাল-নারিকেল-খেজুর গাছের রকমফের সবুজের বিচিত্র সমারোহ, ফলভারে অবনত আম-কাঁঠালের গাছ, সশব্দে আন্দোলিত দীর্ঘ প্রসারিত বাঁশবন—এই সব মনোমুগ্ধকর দৃশ্য তাঁর সুপ্ত কবিচেতনাকে জাগ্রত করেছে। এই সবুজের সমারোহ এবং শ্যামশষ্পাচ্ছাদিত সুবিস্তৃত গঙ্গার তীরভূমির কবিত্বসুলভ বর্ণনায় তাঁর স্বদেশপ্রেমিক চিত্তও উল্লসিত হয়েছে :

"...যার কাছে ইয়ারকান্দী ইরাণি তুর্কিস্তানি গালচে দুলচে কোথায় হার মেনে যায়..."

আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে নতুন দৃষ্টিতে মাতৃভূমিকে দেখে তাঁর অন্তরে গৌরববোধ সঞ্চারিত হয়েছে। স্বদেশের প্রতি তীব্র অনুরাগ

বশতঃই যা তুচ্ছ অনাদৃত উপেক্ষিত অবহেলিত তাকে শ্রদ্ধার বরমালা দিয়েছেন। বাঙলা দেশের প্রকৃতি-চিত্রণে যদি কিছু পক্ষপাতিত্বের সুরও লেগে থাকে, তথাপি তার জন্য তাঁর বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বা সংকোচবোধ নেই। কারণ সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত জবানী হল :

"আপনার লোকের একটি রূপ থাকে, তেমন আর কোথাও দেখা যায় না। নিজের খ্যাঁদা বোঁচা ভাই বোন ছেলে মেয়ের চেয়ে গন্ধর্বলোকেও সুন্দর পাওয়া যাবে না সত্য। কিন্তু গন্ধর্ব-লোক বেড়িয়েও যদি আপনার লোককে যথার্থ সুন্দর পাওয়া যায়, সে আহ্লাদ রাখবার কি আর জায়গা থাকে ?"

আধুনিক যন্ত্রসভ্যতা ইংরেজের প্রচেষ্টায় যে ভাবে বাঙলার বুকে দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে তার জন্য তাঁর কবিচিত্ত হাহাকার করে উঠেছে। যন্ত্রসভ্যতার সম্প্রসারণের ফলে বাঙলা দেশ তার স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে অচিরেই হারিয়ে ফেলবে—এই আশংকা যে অমূলক নয় তা' প্রত্যক্ষ প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে গ্রামের নিশ্চিন্ত নীরবতা যেমন বিঘ্নিত হয়েছে তেমনি শ্যামল বনানী শোভিত বাঙলার নিসর্গ সৌন্দর্যের অবলুপ্তি ঘটেছে অনিবার্য কারণেই। একদিন যে আশংকা করে তিনি বলেছিলেন :

"ঐ ঘাসের জায়গায় উঠবেন—ইটের পাঁজা আর নম্বরে-ইটখোলার গর্তকুল। যেখানে গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলি ঘাসের সঙ্গে খেলা করচে; সেখানে দাঁড়াবেন পাট বোঝাই ফ্ল্যাট আর সেই গাধা বোট ; আর ঐ তাল তমাল আম নীচুর বন ঐ নীল আকাশ, মেঘের বাহার ওসব কি আর দেখতে পাবে ?"

তাঁর সেই আশংকা আজ সত্য প্রমাণিত হয়েছে। গঙ্গার তীরবর্তী সবুজের সমারোহ আজ সত্যই বিলুপ্তপ্রায়, নির্মল আকাশ কলকারখানার চিম্‌নি থেকে ক্রমাগত ধূম উদ্গীরণের ফলে তার সেই সুনীল সৌন্দর্যকে হারিয়েছে, পণ্যবোঝাই জাহাজের ভীড়ে নদীতটের

তৃণাবৃত শ্যামল সৌন্দর্যও বর্তমানে অদৃশ্যপ্রায়। গঙ্গার এই সৌন্দর্যের আসন্ন অবলুপ্তির কথা চিন্তা করে যেমন তিনি বেদনা অনুভব করেছেন তেমনি স্মরণ করেছেন হিন্দু হিসাবে তাঁর সংস্কার বিজড়িত ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও উপলব্ধির কথা।

হৃষীকেশের পর্বতগাত্র-বাহিত গঙ্গার সুনির্মল স্বচ্ছ হিমশীতল জলধারার মধ্যে 'কণপ্রত্যাশী মৎস্যকুলের নির্ভয় বিচরণ' মুগ্ধবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছেন এবং সেই জলধারার বৈরাগ্যপ্রদ স্পর্শও অনুভব করেছেন। কিন্তু কলকাতা অঞ্চলে সেই সুনির্মল গঙ্গার কর্দমাবিল হতশ্রী রূপের প্রতি আকর্ষণের কোন সঙ্গত কারণ না থাকা সত্ত্বেও তিনি কোথায় যেন এক গভীর সম্পর্ক অনুভব করেছেন। এই সম্পর্কের সূত্রসন্ধানে তিনি স্বদেশপ্রিয়তা অথবা বাল্যসংস্কারের প্রসঙ্গ দ্বিধান্বিতভাবে উল্লেখ করেছেন। এই গঙ্গার এমনই সম্মোহন শক্তি যে, বিদেশে বসবাস কালে তিনি তাঁর সংগৃহীত বিন্দু পরিমাণ গঙ্গাবারি পান করে এক অদ্ভুত অনুভূতি লাভ করতেন। ভারতের সংস্কৃতির ধারা যেন, এই গঙ্গাবারির সঙ্গে মিশে আছে; তাই সামান্য বিন্দুপরিমাণ পান করলে পাশ্চাত্যের উচ্ছ্বাসপ্রবণ ধনমদমত্ত ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামুখর জীবনস্রোতের মধ্যে ভারতীয় জন-জীবনের প্রশান্তির আদর্শ অনুভব করতেন এবং মগ্নচৈতন্যে উপলব্ধি করতেন অদ্বৈতবাদী বিবেকানন্দ "হর্ হর্ হর্" ধ্বনি।

গঙ্গাবিধৌত বাঙলার রূপ ও স্বরূপ বর্ণনায় তাঁর স্বদেশপ্রাণতা ও সৌন্দর্যমুগ্ধ কবিপ্রাণের যেমন প্রগলভ্ আত্মপ্রকাশ ঘটেছে তেমনি স্বদেশ ছেড়ে সমুদ্রপথে যখন বিদেশে চলেছেন তখন নিরাসক্ত দৃষ্টি নিয়ে সমুদ্রের বিভিন্ন অবস্থার কবিজনোচিত মুগ্ধতা নিয়ে বর্ণনা করেছেন। বর্ণনার সেই সকল অংশে ইতিহাসচেতনা, জাতিগত স্বরূপ বিচার বা ধর্ম, আচার-আচরণ বিশ্লেষণ কোন অন্তরায় সৃষ্টি করেনি। এ দেখার মধ্যে কোন তত্ত্ব বা তথ্য নেই, কেবল ভাল-লাগাই প্রাধান্য পেয়েছে এবং সৌন্দর্য উপভোগই তার শেষ কথা।

ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে স্বামীজী নিজে বিপদকবলিত হয়েও যে মুগ্ধ বিস্ময়বোধ নিয়ে তার রসগ্রাহী বর্ণনা দিয়েছেন তা' তাঁর কবিত্ব শক্তিকেই প্রমাণিত করে।

গঙ্গাবক্ষ পরিত্যাগ করে গোলকোণ্ডা জাহাজ যখন বিপুল বিস্তৃত সমুদ্রের সীমাহীন জলরাশির মধ্যে প্রবেশ করেছে তখন বিবেকানন্দ মহাকবি কালিদাসের শ্লোকবদ্ধ বর্ণনাই কেবল উদ্ধৃত করেননি সেই সঙ্গে তাঁর অন্তরেও মহাকাব্যিক বর্ণনার ঔদার্য সৃষ্টি হয়েছে। গঙ্গা ও সমুদ্রের মিলনস্থলের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার মধ্য দিয়ে তাঁর গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায় ঃ

"এইখানে ধলায় কালোয় মেশামিশি, প্রয়াগের কিছু ভাব যেন। সর্বত্র দুর্লভ হলেও 'গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে।"

গঙ্গাকে পেছনে রেখে তাঁর জাহাজ এগিয়ে চলেছে কিন্তু তার স্মৃতিকে ভোলা তাঁর পক্ষে খুব সহজ নয়, তাই বার বার গঙ্গার কথা স্মরণ করেছেন। তিনি তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষকের মত লক্ষ্য করেছেন গভীরতা অনুযায়ী জলের বর্ণভেদ—কোথাও সাদা কোথাও কালো আবার কোথাও বা 'নীলকেশ, নীলকান্ত অঙ্গ আভা, নীল পট্টবাস পরিধান।' দিগন্তপ্রসারিত সমুদ্রের বিপুল শান্ত জলরাশি বৃষ্টি ও বাতাসের সংস্পর্শে যখন অশান্ত হয়ে ওঠে তখন তার ভয়ঙ্কর রূপ-বর্ণনায় সুনিপুণ কুশলী কাব্যকারের মত দেবাসুরের যুদ্ধের পৌরাণিক কাহিনীর উপমা দিয়ে সার্থক বর্ণনা দিয়েছেন। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের গুরু গর্জন এবং উত্তাল তরঙ্গায়িত সমুদ্রের রূপচিত্র বর্ণনা যেন দক্ষ শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবির মত পাঠকের দৃষ্টির সামনে তিনি প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন ঃ

"উপরে বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের জীমূতমন্দ্র, চারিদিকে শুভ্রশির তরঙ্গকুলের লম্ফ ঝম্প, গুরুগর্জন, পোতশ্রেষ্ঠের সমুদ্রবল উপেক্ষা-কারী মহাযন্ত্রের হুহুঙ্কার—সে এক বিরাট্ সম্মিলন—তন্দ্রাচ্ছন্নের ন্যায় বিস্ময়রসে আপ্লুত হইয়া ইহাই শুনিতেছি ;..."

কিরূপ নির্লিপ্ত কবিদৃষ্টির অধিকারী হলে বর্ণনা এত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে পারে তার যথেষ্ট প্রমাণ এই অংশে বিদ্যমান। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ দোদুল্যমান জাহাজের অভ্যন্তরে তাঁর সহযাত্রীদের প্রতি কৌতূহলী দৃষ্টিও নিক্ষিপ্ত হয়েছে। সমুদ্রপীড়ায় আক্রান্ত স্বামী তুরীয়ানন্দ ও অপর দুটি বিদেশগামী বাঙালী ছাত্রের মানসিক অবস্থা বর্ণনাটি বেশ রসিকতাপূর্ণ। অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর 'পথে প্রবাসে' নামক ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এই সমুদ্রপীড়ার যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে বিবেকানন্দের বর্ণনার কেবল সমর্থনই পাওয় যায় তাই নয়; কতকটা তাঁকে অনুসরণ বললেও অত্যুক্তি হয় না। দু'জনের বর্ণনা পাশাপাশি উল্লেখ করলে এই অভিমতের সমর্থন পাওয়া যাবে:

"বাঙালীর ছেলে দুটিও ভারি 'সিক'। একটি ত ঠাউরেচে মরে যাবে ;..." (পরিব্রাজক, পৃ. ৫১)।

"...কেউ বা ভাবে মরণ হলেই বাঁচি, কেউ বা ভাবে মর্তে আর দেরি নেই।" (পথে প্রবাসে, পৃ. ৬)।

এই ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের আরও ভয়াবহ বাস্তবসম্মত বর্ণনা আছে কলম্বো পরিত্যাগের পর মনসুন অঞ্চলের ভিতর দিয়ে জাহাজ চলার সময়। সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে জাহাজের অভ্যন্তরে কিরূপ বিপর্যস্ত অবস্থার সৃষ্টি হয় সে তথ্যও তাঁর এই ভ্রমণবৃত্তান্তে নিখুঁতভাবে দিয়েছেন।

যে ভ্রমণ উদ্দেশ্যমূলক এবং ভ্রমণবৃত্তান্ত পরিবেশনের মধ্যেও যেখানে বিবেকানন্দের উদ্দেশ্যবাদিতা স্পষ্ট সেই ভ্রমণকাহিনী পাঠ সাধারণ সাহিত্যরসিকের কাছেও যাতে ক্লান্তিকর একঘেয়েমীতে পর্যবসিত না হয় তার জন্য বর্ণনার মধ্যে তিনি বিবিধ সাহিত্যরস সঞ্চারের চেষ্টা করেছেন। এই অংশে তাঁর নিসর্গপ্রীতি ও কবিসুলভ পরিবেশন নৈপুণ্যের কিছু পরিচয় উদ্ধার করা গেল। বিবেকানন্দ কবিত্বের সংস্কার নিয়েই যেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। একাধিক কবিতাও তিনি রচনা করেছেন। সুপ্রাচীন কাল থেকে কাব্যাকারে

সাধন-চিন্তার প্রকাশ ভারতবর্ষে সাধনার একটি বিশিষ্ট ঐতিহ্য এবং এই সাধন-কথা-বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকেই উপনিষদের যুগ থেকে অজস্র কবিতা সৃষ্টি হয়ে আসছে। বিবেকানন্দ সাধন-মার্গে উপলব্ধ সত্যকে কাব্যাকারে অনেক সময় প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের সাহিত্য সাধনার একজন বিশিষ্ট সমালোচকের অভিমত উৎকলনযোগ্য:

> "সমগ্র ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যে তুলনারহিত কবিতা—তাঁর 'Kali the mother' (জননী কালিকা—'মৃত্যুরূপা মাতা') —নবযুগের ঋষিকবির ধ্যাননেত্রে জগজ্জননীর যে চিত্রচেতনাময় রূপ ফুটে উঠেছে তার অপার বিস্ময়রস সাধক ও সাহিত্যিক মাত্রের কাছেই অমূল্য সম্পদ বলে মনে হবে।"[১]

কবিপ্রতিভা যার স্বভাবধর্মের অঙ্গীভূত অধ্যাত্মচিন্তার বাইরেও যে তার প্রকাশ ঘটবে তা আর বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। তাই ভ্রমণ-পথের বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনার স্বল্প সুযোগেই তাঁর কবিপ্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কবিতা রচনার সূত্রেই সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব ঘটে। কবিতায় ভাষণের যে দীপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল তা আরও ভাস্বর এবং তেজদৃপ্ত হয়ে ওঠে তাঁর সাহিত্যকৃতির মধ্যে।

১. শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ—বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য; পৃ. ১০৮

৬

॥ দেশ-বিদেশ প্রসঙ্গ ॥

ভারতবর্ষ থেকে দ্বিতীয় বিদেশ যাত্রার এই সুদীর্ঘ জলপথের পার্শ্ববর্তী অসংখ্য দেশ, গ্রাম, নগর, জনপদ পর্যটক-বিবেকানন্দ দেখেছেন এবং এই সকল কিছুর বর্ণনা দেওয়া এবং তাকে সাহিত্যপদবাচ্য করে তোলা যে তাঁর আয়ত্তাধীন ছিল তা সংশয়ের অপেক্ষা রাখে না। তথাপি তিনি কয়েকটি নির্বাচিত দেশ ও অঞ্চলের পরিচয় জ্ঞাপনেই তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তকে সংহত করেছেন। এই সম্পর্কে তাঁর উদ্দেশ্য-বাদিতা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। যে সকল দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতি, শিক্ষা-সাধনা, ধর্ম ও দর্শনের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য আছে সেই সকল দেশের ইতিবৃত্তান্ত-বর্ণনাতেই তাঁর পর্যটক-হৃদয়ের স্ফূর্তি লক্ষ্য করা গেছে এবং সেই সকল দেশের উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক-সূত্র সন্ধান করেছেন। তাঁর সুগভীর দেশপ্রীতিবোধের উৎস থেকেই যদিও এই অনুসন্ধিৎসা জেগেছে, তথাপি কোথাও তথ্য বিকৃত করে সত্যের অপলাপ ঘটাননি। ভারতের অঞ্চল বিশেষের বর্ণনায় তাঁর যে পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করা যায় তারও সঙ্গত কারণ আছে। স্বদেশের যে অঞ্চল বৈদেশিক আক্রমণ ও অন্যবিধ বিপর্যয়ে আপন স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করেছে এবং ধর্মপ্রাণ ভারতবর্ষে নতুন নতুন আধ্যাত্মিক চিন্তা-চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে শক্তি বৃদ্ধি করেছে সেই মাদ্রাজ প্রসঙ্গে তাঁর আলোচনাটি একটু দীর্ঘায়ত হয়েছে। তাছাড়া জগৎসভায় ভারতবর্ষকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার প্রচেষ্টায় তাঁকে যে দেশ সর্বাধিক সহযোগিতা, সাহায্য ও উৎসাহ দিয়েছে সে দেশ হল মাদ্রাজ। সুতরাং মাদ্রাজ-প্রসঙ্গ বর্ণনায় তাঁর পক্ষ-পাতিত্বটিকে দোষাবহ মনে করা অসঙ্গত হবে।

॥ মাদ্রাজ ॥

মাদ্রাজের সঙ্গে বিবেকানন্দের প্রথম পরিচয় ঘটে ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে। তখন তাঁর বয়স তিরিশ বছর। এই সময়ে মৈসূর-পতি চামরাজ ওডেয়র ও তাঁর দেওয়ান শেষাদ্রি অয়্যর স্বামীজীর বিশেষ গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েন এবং তাঁর সম্ভাব্য আমেরিকা যাত্রার প্রসঙ্গ উঠলে রাজা তার ব্যয়ভার বহনে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু স্বামীজী রাজার দেওয়া অর্থ গ্রহণ না করে, কোচিনের পথে ত্রিবান্দ্রমে তামিল ভাষী ব্রাহ্মণ কে. সুন্দররাম অয়্যরের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। ন'দিন পর ত্রিবান্দ্রম্ থেকে বিদায় নিয়ে কন্যাকুমারীতে এসে ভারতবর্ষের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে শততরঙ্গভঙ্গে মাতৃভূমির পদ-বন্দনারত মহান্ সিন্ধুর রূপদর্শন করে অভিভূত হয়ে পড়লেন এবং সমুদ্র জলবেষ্টিত তীরসন্নিহিত শিলাখণ্ডের উপর ধ্যানাসীন্ হয়ে ভারত-আত্মার স্বরূপ দর্শন করলেন। ১৮৯৩-এর ফেব্রুআরিতে মাদ্রাজে তিনি এক ভাষণে তাঁর পশ্চিম যাত্রার সংকল্প ঘোষণা করেন। দক্ষিণ ভারতীয় জনসমাজের রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা তাঁর এই সংকল্পের কার্যকর বিরোধিতা সৃষ্টি করতে পারেনি। যুব-সমাজ ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তাঁর উদার ধর্মমতের আহ্বানে সাড়া দিল এবং বিপুল উৎসাহে বিবেকানন্দের আমেরিকা যাত্রার পাথেয় সংগ্রহ করে দেয়। এই অর্থ সংগ্রহে স্বামীজীর বিশিষ্ট গুণগ্রাহী ও ভক্ত আলাসিঙ্গা পেরুমলের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রতি ঘরে ভিক্ষা করে স্বামীজীর বিদেশ যাত্রার জন্য পাঁচশো টাকা সংগ্রহ করে দেন।

মাদ্রাজে তাঁর এই প্রথম উপস্থিতি অবশ্য সর্বৈব সুখকর হয়নি কারণ, দক্ষিণ ভারতীয় জনসমাজের একাংশের কাছে উত্তরাপথের হিন্দুরা তখন বিশেষ মর্যাদা পেত না; তাদের ধারণা ও বিশ্বাস ছিল উত্তর ভারতের হিন্দুসভ্যতার সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় দ্রাবিড় জাতির

কোন সম্পর্ক নেই। ত্রিবান্দ্রমে জনৈক অধ্যাপকের কাছে অনুরূপ অভিমত শুনে তিনি সুন্দররাম অয়্যরের কাছে তাঁর মর্মবেদনা জানান। তাছাড়া দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণদের কাছে যেখানে মাছ-মাংস অভ্যক্ষ সেখানে তাঁর এই সকল ভোজ্যপ্রীতি ঘৃণ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হয়েছে। এই দেশে ব্রাহ্মণ সমাজের পক্ষে তাঁকে গ্রহণ করার সবচেয়ে বড় অন্তরায় হয়েছিল ব্রাহ্মণেতর কুলে জন্মলাভ। এই সকল ঘটনাগুলির জন্য যেমন তাঁর মাদ্রাজ পরিভ্রমণ স্মরণীয় হয়ে আছে তেমনি ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে জানুআরি মাসে স্বামীজী শিকাগো বক্তৃতার পর প্রথম স্বদেশের মাটি মাদ্রাজে পদার্পণ করে যে অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা লাভ করেন তা' তাঁর কাছে সর্বাধিক স্মরণীয়।

তাঁর জীবনের বহু স্মৃতি-বিজড়িত এই মাদ্রাজে দ্বিতীয়বার বিদেশ যাত্রাপথে উপস্থিত হবার সুযোগ ঘটলে ভ্রমণবৃত্তান্ত-বর্ণনায় মাদ্রাজ-প্রসঙ্গ স্মরণ করার অবকাশ করে নিয়েছেন। ভারতবর্ষে বাঙলা দেশের পর তাঁর জীবন-প্রবাহের সঙ্গে মাদ্রাজই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত অঞ্চল। ইতিপূর্বে মাদ্রাজ বসবাসকালে দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পরিচয় ঘটেছিল কিন্তু কর্তব্যবোধের প্রবল আহ্বানে সেই পরিচয়কে পূর্বাপর ইতিহাস সমাজ দর্শন ও ধর্মচেতনা প্রভৃতির সঙ্গে অন্বিত করে দেখার সুযোগ করে নিতে পারেননি। এইবার তাঁর সেই সুযোগ আসে—দক্ষিণ ভারতবাসীর জাতীয় জীবনকে ভিতর এবং বাইরে থেকে, অতীতের পটে স্থাপন করে এবং প্রখর আলোকিত বর্তমানের প্রান্তরে উপস্থাপিত করে দেখেছেন। সে লেখায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দৈনন্দিন জীবনাচরণ, গৌরবোজ্জ্বল অতীত ইতিহাস এবং ধর্মীয় ও দার্শনিক ঐতিহ্যসম্পন্ন সমগ্র দক্ষিণ ভারত।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুন রাত্রে মাদ্রাজ বন্দরে 'গোলকোণ্ডা' জাহাজ এসে পৌঁছায় এবং তারপর দিন অর্থাৎ ২৫শে জুন সন্ধ্যার সময় জাহাজ মাদ্রাজ বন্দর পরিত্যাগ করে। সুতরাং দ্বিতীয়বার বিদেশ যাত্রাপর্বে তাঁর মাদ্রাজে অবস্থিতিকাল অল্প-বিস্তর এক ' ।

এই স্বল্প সময়ে মাদ্রাজ বা দক্ষিণ ভারত সম্পর্কে সমগ্র তথ্য সংগ্রহ যে-কোন মানুষের পক্ষেই অসম্ভব। কিন্তু ইতিপূর্বে তাঁর দীর্ঘ সময়ব্যাপী দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণের সুযোগ ঘটায় ঐ দেশ ও দেশবাসী সম্পর্কে মোটামুটি একটি সামগ্রিক পরিচয় সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল, তাছাড়া বহুমুখী শাস্ত্র-সাহিত্য পাঠের ফলেও এই পরিচয়ের গভীরতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। মাদ্রাজ-বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে যদিও বস্তুগত বর্ণনারই (matter of fact) প্রাধান্য ঘটেছে, কিন্তু সেই তথ্য পরিবেশনকেও পরিহাস রসিকতার দ্বারা সরস করে তোলার চেষ্টা করেছেন। প্রথমেই দেখি দক্ষিণ দেশবাসীর প্রতি তাঁর সকৌতুক দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে; তার পর সেই জনতা ও জন-সংস্কৃতি থেকে তাদের জীবন-সাধনা ধর্ম-দর্শন ও ঐতিহাসিক পরিচয় উদ্ধারের চেষ্টা করেছেন। দক্ষিণভারত প্রধানত শৈবধর্মের দেশ। কিন্তু একাদশ শতাব্দীতে বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদের প্রবর্তক রামানুজের আবির্ভাব ঘটলে দেশবাসীর মধ্যে বৈষ্ণব-ধর্মের ব্যাপক প্রসার হয়। এই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সমগ্র ললাট-পরিব্যাপ্ত চন্দনচর্চিত তিলকশোভিত মুখমণ্ডলের বর্ণনা দিতে গিয়ে একটি পরিহাস-রসিক প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন:

> "সে রামানুজী তিলক-পরিব্যাপ্ত ললাটমণ্ডল—দূর থেকে, যেন ক্ষেত চৌকি দেবার জন্য কেলে হাঁড়িতে চূণ মাখিয়ে পোড়া কাঠের ডগায় বসিয়েছে..."

এই রসিকতার রেশ মিলিয়ে যাবার আগেই বাঙলা দেশের বৈষ্ণবদের তিলকচর্চা ও রামানুজী সম্প্রদায়ের তিলকচর্চার পার্থক্য নিয়ে একটি উচ্চকণ্ঠ হাস্যরোলের সৃষ্টি করেন:

> "আমাদের দেশে চৈতন্যসম্প্রদায়ের সর্ব্বাঙ্গে ছাপ দেওয়া গোঁসাই দেখে মাতাল চিতেবাঘ ঠাওরেছিল—এ মাদ্রাজি তিলক দেখে চিতে বাঘ গাছে চড়ে!"

দক্ষিণ ভারতের আঞ্চলিক ভাষার দুর্বোধ্যতা ও আহার্য কিরূপ অভ্যক্ষণীয় সে সম্পর্কে একান্ত বাঙালী সুলভ ভোজনরসিক

সমালোচকের ভূমিকাতেও বিবেকানন্দকে আমরা দেখতে পাই। এই শ্রেণীর সমালোচনা তাঁর জাতি-বৈর বা জাতি-বিদ্বেষের ফল নয়। দক্ষিণ ভারতীয়ের কয়েকটি বিশিষ্টতাই এই সকল মন্তব্যের আলোকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—'এ না হলে, কি দক্ষিণ মুলুক হয়?'

দক্ষিণ ভারতের ধর্মগত ঐতিহ্যের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন সমগ্র ভারতবর্ষের ধর্মপ্রবাহে এই অঞ্চলের দান কি গভীর। অষ্টম শতাব্দীতে অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক শঙ্করাচার্য, একাদশ শতাব্দীতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ, বেদের ভাষ্যকার সায়ন ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভেদবাদী বা দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্য (মধ্বমুনি) জন্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধধর্মের দুর্বার প্রবাহ থেকে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করার জন্য বৈদান্তিক শঙ্করাচার্য ভারতবর্ষের চতুঃসীমাকে অদ্বৈতবাদের দ্বারা বাঁধতে সক্ষম হন এবং দেশের চারটি প্রান্তে চারটি শিবমন্দির স্থাপন করেন। বাঙলা দেশে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের বহু পূর্বে রামানুজ ও মধ্বাচার্য ভক্তিবাদী বৈষ্ণবধর্মের প্রচার করেন এবং পরবর্তী কালে বাঙলা দেশে প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব এই ধর্মাদর্শের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে। সমগ্র ভারতবর্ষে কবীর, দাদু, নানক, রামসেনহী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীরামচরণ প্রমুখ যে সব ধর্মপ্রবর্তক স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁরাও অল্প-বিস্তর এই দক্ষিণ ভারতীয় ধর্মনেতাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এই অঞ্চলের গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি অনিবার্য ভাবে ইতিহাসের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেছেন, মুঘলসম্রাট-শ্রেষ্ঠ আকবরের শাসনকালে সমগ্র উত্তর ভারত যখন পদানত তখন এই দক্ষিণ ভারতীয় সম্রাটরাই আপন স্বাধীনতার পতাকে উড্ডীন রাখতে সক্ষম হয়েছিল:

> "এই দক্ষিণ-দেশেই—যখন উত্তর ভারতবাসী, 'আল্লা হু আকবর, দীন্ দীন্' শব্দের সামনে ভয়ে ধনরত্ন ঠাকুর দেবতা স্ত্রী পুত্র ফেলে ঝোড়ে জঙ্গলে লুকুচ্ছিল,—রাজচক্রবর্তী, বিদ্যা-নগরাধিপের অচল সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল।"

মুঘল সম্রাটের গর্বোদ্ধত পদচারণায় যখন অধিকাংশ হিন্দু-ভারতবাসীর মানমর্যাদা ধূলিলুণ্ঠিত তখন দক্ষিণ ভারতের হিন্দু-রাজাদের স্বাধীন রাজ্য পরিচালনা ও একাধিক হিন্দুধর্মনেতার আবির্ভাবে অপরাপর অঞ্চলের ধর্মনেতাদের ধর্মচিন্তায় তার স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করে বিবেকানন্দের এই অঞ্চল সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধাবোধের জগরণ ঘটেছে। এই দক্ষিণ ভারত হিন্দুধর্ম ও দর্শনকেই কেবল পুষ্ট করেনি, সেই সঙ্গে স্বাধীন হিন্দুরাজত্ব ও বজায় রাখার মত শক্তি-সামর্থ্য দেখিয়েছে ; তাই বিবেকানন্দ এই দেশ সম্পর্কে এত সপ্রশংস বর্ণনা দিয়েছেন। বহির্ভারতে মাদ্রাজের তামিল জাতির সুমের শাখার ইউক্রেটিস নদীর তীরে সভ্যতাবিস্তারে সহায়তা করা ; জ্যোতিষ, ধর্মকথা, নীতি-আচারের মাধ্যমে আসিরি বাবিল সভ্যতার পুষ্টি সাধন, পুরাণ কথায় বাইবেল রচনায় প্রেরণা দান, মিসরি সভ্যতার বনিয়াদগঠনে কার্যকর প্রভাব বিস্তার এবং আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে এই সভ্যতার সংযোজনা দক্ষিণ ভারতের গৌরবময় ভূমিকাকেই প্রকাশ করে। বহির্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের মত তিনি কেবল বাহ্যিক রীতি-নীতি, আচার-আচরণকেই লক্ষ্য করেননি, গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোকে দক্ষিণ ভারতের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন।

ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে তিনি তাঁর প্রতি মাদ্রাজবাসীদের গভীর প্রীতির কথা স্মরণ না করে পারেননি। মাদ্রাজ পরিত্যাগের প্রাক্কালে বিবেকানন্দকে দেখবার জন্য এবং অন্তরের গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে অগণিত মাদ্রাজ-বাসী নৌকায় করে সূর্যের প্রখর উত্তাপের মধ্যে জাহাজ না ছাড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগল। বিবেকানন্দও তাঁদের দর্শন দেবার জন্য জাহাজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থেকে শেষে ক্লান্ত হয়ে তাদের নিজ নিজ বাড়ি ফিরে যেতে অনুরোধ জানান, কিন্তু তাতেও বিশেষ ফল

না হওয়ায় শেষে ধমক দিয়ে তাদের বাড়ি ফিরতে বাধ্য করেন। বিবেকানন্দের আমেরিকাযাত্রার পাথেয় সংগ্রহে তাঁর যে অসীম গুণমুগ্ধ ভক্ত আলাসিঙ্গা পেরুমল সর্বাধিক উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখিয়েছিল সেই আলাসিঙ্গা বিবেকানন্দের সঙ্গে আলোচনার জন্য নিতান্ত সাধারণ বেশবাস ও আহার্য নিয়ে মাদ্রাজ থেকে সিংহল পর্যন্ত গমনের জন্য জাহাজে আরোহণ করেন। জাহাজ বন্দর ছাড়বার পূর্বমুহূর্তে তিনি লক্ষ্য করেন অসংখ্য মাদ্রাজী স্ত্রী-পুরুষ বালক বালিকা তাঁকে বিদায়-অভিনন্দন জানাবার জন্য তখনও পর্যন্ত বন্দরের বাঁধের উপর অপেক্ষা করছিল এবং জাহাজ ছাড়া মাত্র তাদের সহস্র কণ্ঠে বিদায়সূচক ধ্বনি মাদ্রাজের আকাশ-বাতাসকে প্রকম্পিত করে তুলল।

॥ সিংহল ॥

আমেরিকায় ঐতিহাসিক ধর্মমহাসম্মেলনে যোগদানের পথে এই দ্বিতীয় বার তাঁর সিংহল দেখার সুযোগ হয়। ২৫শে জুন রাত্রে জাহাজে মাদ্রাজ-বন্দর থেকে সিংহল যাত্রাপথে তুরীয়ানন্দ ও নিবেদিতা ছাড়া বিবেকানন্দের তৃতীয় সঙ্গি আলাসিঙ্গা পেরুমল। মাদ্রাজ থেকে কলম্ব চার দিনের পথ—বিবেকানন্দেরএই কথামত জাহাজ ২৯শে জুন অথবা কিছু পূর্বে পৌঁছানোর কথা, বিবেকানন্দ জানিয়েছেন 'পঁচিশে জুন প্রাতঃকালে জাহাজ কলম্বো ছাড়ল'। সুতরাং তারিখ নির্দেশে কিছু অসঙ্গতি আছে। অবশ্য 'পরিব্রাজক' গ্রন্থের মুখবন্ধেই তিনি এই তারিখ নির্ধারণ বিষয়ে অক্ষমতার কথা পূর্বেই স্বীকার করেছেন—'তুয়ের নম্বর—তারিখ প্রভৃতি মনেই মনেই থাকে না'। সিংহলের প্রাথমিক পরিচয় প্রসঙ্গে রামায়ণের রামচন্দ্রের লঙ্কাধিপতি রাবণ রাজাকে পরাজিত করে লঙ্কা

জয়ের কথা বলেছেন। এই সিংহলে রামচন্দ্র ও তাঁর পূর্বপুরুষের কিছু পৌরাণিক নিদর্শনও তিনি দেখেছেন। কিন্তু প্রসঙ্গতঃ বলেছেন সিংহলবাসীরা সিংহলকে লঙ্কা নামে অভিহিত করতে রাজী নয়। তিনি তার বিরুদ্ধতা না করে সহাস্য সমর্থনের সুরেই বলেছেন : এদের দৈহিক গঠন, কথাবার্তা, পোশাক-পরিচ্ছদ রাবণ কুম্ভকর্ণের বংশধরের উপযুক্ত নয়। বঙ্গ সন্তানদের সঙ্গে বরং সাদৃশ্য আছে :

"ঐ যে একদল দেশে উঠচে, মেয়েমানুসের মত বেশভূষা, নরম নরম বুলি কাটেন, এঁকে-বেঁকে চ'লেন, কারুর চোখের উপর চোখ রেখে কথা কইতে পারেন না, আর ভূমিষ্ঠ হয়ে অবধি পিরীতের কবিতা লেখেন, আর বিরহের জ্বালায় 'হাসেন-হোসেন' করেন—ওরা কেন যাক্ না বাপু সিলোনে।"

—বাঙালী চরিত্রের এমন অসংকুচিত ব্যাখ্যায় তাঁর গভীর অন্তর বেদনাকেই প্রকটিত করেছেন। তিনি বাঙালীর সর্বাত্মক বলিষ্ঠতা চান বলেই এমন সমালোচনা-মুখর হয়েছেন।

বাঙালী রাজপুত্র বিজয়সিংহের সিংহল বিজয়ের কাহিনীকে তিনি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে 'বাঙালী বদমায়েসের কীর্তি বলে অভিহিত করেছেন। কারণ, বিজয়সিংহ বর্তমানে 'বেদ্দা' নামে পরিচিত জাতির আদিম অরণ্যবাসীদের অধিপতির আতিথ্য ও কন্যা লাভ করে পরিশেষে চরম বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করেন। প্রথমে ঐ রাজাকে সপারিষদ্ হত্যা, পরে তাঁর কন্যাকে পরিত্যাগ করে ভারতবর্ষ থেকে পুরুষ ও মহিলা সহচর নিয়ে আসেন এবং অনুরাধা নামে এক ভারতীয় নারীকে বিবাহ করেন। এই ব্যাখ্যা বাঙালী বা ভারতবাসী হিসাবে অনেকের কাছে মনঃপূত না হলেও বিবেকানন্দের চিন্তাধারার স্বাতন্ত্র্য এর মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে। নিজের জাতিও বিশ্বাসঘাতকতা বা অন্যায় করলে বিবেকানন্দ তাকে ক্ষমা করেননি—এইখানেই অন্যান্য বাঙালী বা ভারতবাসীর চরিত্র থেকে তাঁর চরিত্রের তফাৎ।

সিংহলবাসীদের ধর্মীয় জীবন আলোচনা করতে গিয়ে বৌদ্ধ-ধর্মের প্রচার ও প্রসার থেকে শুরু করে বৌদ্ধধর্মের দল-উপদল-জনিত ক্রমাবনতি, তামিলদের প্রচেষ্টায় হিন্দুধর্মের বিস্তার এবং পরবর্তীকালে ইউরোপীয়দের উপস্থিতিতে খ্রীস্টানধর্মের প্রভাব প্রভৃতি বর্ণনায় সিংহলের সামগ্রিক ধর্মীয় পরিচয় তুলে ধরেছেন। এই ধর্মজীবন আলোচনার মত গভীর বিষয়ের গুরুত্ব রক্ষা করে তিনি গল্পের সরসতা দিয়ে বর্ণনাকে সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ রূপ দিয়েছেন। ভারত-সম্রাট অশোকের ধর্মনীতি অনুযায়ী তাঁর পুত্র (মতান্তরে ভ্রাতা) মাহিন্দো ও কন্যা সংঘমিত্তার প্রচেষ্টায় অরণ্যচারী অসভ্য সিংহলীদের জীবন শৃঙ্খলাবদ্ধ হয় এবং সমগ্র সিংহলবাসী নৈষ্ঠিক বৌদ্ধধর্মাবলম্বীতে পরিণত হয়। এই বৌদ্ধধর্মের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়াতেই অনুরাধাপুরমের মত শহর গড়ে ওঠে—আজও সেই শহরের ভগ্নস্তূপ বিদ্যমান। দেশের বিভিন্ন স্থানে যেমন বুদ্ধের বিভিন্ন মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তেমনি ধর্মহীনদের মধ্যে ভীতি উৎপাদনের জন্য পর্বতগাত্রে নরক-যন্ত্রণার বিভৎস ছবি চিত্রিত করা হয়। এই হিংসাত্মক চিত্রকলা অহিংস নীতিবিরোধী বলে বিবেকানন্দ ব্যাখ্যা করেছেন এবং অহিংস নীতিবিশ্বাসীদের নীতির সারবত্তা উপলব্ধির অক্ষমতা সম্পর্কে একটি সরস গল্পের অবতারণা করেছেন। কোন এক অহিংস নীতিবিশ্বাসী গৃহস্থের বাড়ি চোর ধরা পড়ায় বাড়ির লোক-জন অহিংসা ভুলে চোরকে মারধোর শুরু করলে গৃহস্বামী তাদের হিংসা পরিত্যাগ করে চোরকে বস্তাবন্দী অবস্থায় জলে ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে অহিংস নীতির এক হাস্যকর পরাকাষ্ঠা দেখান। বৌদ্ধদের সকল ধর্মের প্রতি সমদৃষ্টি সম্পর্কে যে ধারণা প্রচলিত আছে সেই ধারণার বশবর্তী তিনিও ছিলেন; কিন্তু পর্যটনকালে উন্মুক্ত প্রান্তরে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে আলোচনার সময় তিনি বৌদ্ধভিক্ষু ও অন্যান্য বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের দ্বারা কি কুৎসিত ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন সে সম্পর্কেও তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন। বিবেকানন্দ এই

সমালোচনা করার যথেষ্ট অধিকারী, কারণ বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মব্যাখ্যাতা হিসাবে সকল ধর্মের সম্পর্কে সমমর্যাদাবোধ-সম্পন্ন ছিলেন। বিবেকানন্দ স্পষ্ট কথা বলায় মনরক্ষার তাগিদ কখনও অনুভব করেননি। নিজের ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে আলোচনায়ও তিনি কোন দুর্বলতা দেখাননি—সেখানেও তিনি মুখর সমালোচক।

বৌদ্ধধর্মপ্রধান সিংহল সম্পর্কে তাঁর পরিবেশিত তথ্য থেকে জানতে পারি যে, তামিল জাতির প্রচেষ্টায় সিংহলের উত্তরাংশে হিন্দুধর্মের যথেষ্ট প্রসার ঘটে। বৌদ্ধরা হিন্দুধর্মের এই অগ্রগতিকে রোধ করবার জন্য কান্দি নামে পার্বত্য শহরে সুদৃঢ় বসতি স্থাপন করে কিন্তু তামিলদের কাছে তাও হস্তচ্যুত হয়। এই ভাবে উত্তর-সিংহল হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে পরিণত হয়। তামিলদের প্রচারিত এই হিন্দুধর্ম অদ্বৈতবাদী শিব-উপাসনা নির্ভর। সেই জন্য হিন্দুর উর্ধ্বে শৈব পরিচয়ই প্রাধান্য পেয়েছে। উত্তর-সিংহলে তামিল প্রচারিত হিন্দুধর্মের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে। এখানকার হিন্দুদের জাত বা শ্রেণীগত কোন পরিচয় নেই, বিবাহের ব্যাপারে ধর্মীয় কঠোরতা বা বিধিনিষেধ নেই। এর প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়াস্বরূপ লক্ষ্য করা যায় যে, এরা অনায়াসেই মহাদেবের বিভূতি কপালে মেখে হিন্দুত্ব অর্জন করতে পারে।

সিংহল প্রসঙ্গে বর্ণনা দিতে গিয়ে পূর্ব এশিয়ায় বৌদ্ধধর্মের অবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়েছেন। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে রক্ষিত বুদ্ধদেবের দাঁত সংগ্রহ করে সিংহলের কান্দিতে প্রতিষ্ঠা, সিংহলবাসীদের দেশ সম্পর্কে ধারাবাহিক ইতিহাস রক্ষা, শাস্ত্রকথা লিপিবদ্ধ করা প্রভৃতি তথ্য তিনি নিতান্ত স্বল্প পরিসরে পরিবেশন করেছেন। স্বামীজী সিংহল থেকে ব্রহ্ম, শ্যাম প্রভৃতি দেশে প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম ও চীন-জাপান সহ ভারতের উত্তর সীমান্তবর্তী পার্বত্য রাজ্যগুলির বৌদ্ধধর্মের স্বরূপগত পার্থক্য বেশ সুস্পষ্ট অথচ সংক্ষিপ্ত

আকারে বিশ্লেষণকরেছেন। সিংহল, শ্যাম, ব্রহ্ম প্রভৃতি অঞ্চলের বৌদ্ধরা হীনযানপন্থী প্রাচীন বৌদ্ধধর্মকেই তারা অনুসরণ করে। কিন্তু অবশিষ্ট অঞ্চলের বৌদ্ধরা মহাযানপন্থী—তারা, অবলোকিতেশ্বর প্রভৃতি দেবদেবী ও তন্ত্রমন্ত্রের অনুসরণ করে বৌদ্ধধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য থেকে অনেক সরে এসেছে। তিব্বতীরা হিন্দুর শিবসাধনার সকল রীতি-নীতিই প্রায় গ্রহণ করেছে এবং হিন্দুর তন্ত্রসাধনায় বর্ণময় দেবীর যে পরিকল্পনা করা হয় চীন ও জাপানের বৌদ্ধ মন্দিরগুলির গাত্রে তন্ত্রোক্ত সেই সব বর্ণ লিখিত হয়েছে।

সিংহলের প্রাচীন অবস্থা থেকে বর্তমান পর্যন্ত—এই সুবিস্তৃত ইতিহাস এই সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে আলোচিত হলেও পূর্ণাঙ্গতার দাবী রাখে। পর্যটকের সময়ের স্বল্পতা বর্ণনায় দ্রুততা এনে দিয়েছে বটে, কিন্তু পরিব্রাজকের কাছ থেকে দেশভ্রমণের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা শোনার প্রত্যাশা থেকে বিবেকানন্দ পাঠককে বঞ্চিত করেননি। তাঁর মাদ্রাজী গুণমুগ্ধ ভক্ত আলাসিঙ্গা সিংহল থেকে দেশের পথে ফিরে গেল এবং তুরীয়ানন্দ ও নিবেদিতা সহ বিবেকানন্দ পঁচিশে জন সিংহল বন্দর পরিত্যাগ করলেন।

॥ এডেন ॥

৮ই জুলাই তারিখে এডেন বন্দরকে স্পর্শ করে ইউরোপে প্রবেশ করার সুযোগ বিবেকানন্দের এই বার নিয়ে দ্বিতীয়বার বিদেশ যাত্রা-কালে ঘটে। আফ্রিকার উপকূলবর্তী আরব সাগরের এই বন্দর-প্রধান অঞ্চলটির প্রাচীন ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপেক্ষা পরবর্তীকালে সমগ্র ইউরোপীয় দেশগুলির কাছে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় বিবেকানন্দ তদনুরূপ বর্ণনা দিয়াছেন। স্বল্প-পরিসর আলোচনায় সামগ্রিক পরিচয়ের আস্বাদ সৃষ্টির জন্য প্রথমে

এই অঞ্চলের ভূ-প্রাকৃতিক বর্ণনা দিয়েছেন। বৃক্ষহীন তৃণহীন পাহাড়-পর্বতপ্রধান বালুকাময় মরু অঞ্চল এই এডেন। দেশটির প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় বলেছেন যে, রোমান বাদ্‌সা কন্‌স্টান্‌-সিউস খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য একদল ধর্মপ্রচারক পাঠান, কিন্তু স্থানীয় আরবদের হাতে তাঁরা নিহত হন। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ রোমান বাদ্‌সা তাঁর বন্ধু-দেশ ক্রিশ্চিয়ান হাব্‌সি রাজাকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। হাব্‌সি রাজা এডেনের আরবদের যথেষ্ট শাস্তি দেয় এবং পরবর্তী কালে ক্রমান্বয়ে এডেন অঞ্চল ইরাণের সামা-নিডি বাদ্‌সা, পর্তুগীজ, তুরস্ক প্রভৃতি রাজা ও রাজ্যের অধিকারভুক্ত হওয়ার পর পুনরায় আরব অধিকৃত হয়। পরবর্তীকালে সাম্রাজ্য-বিস্তারের প্রতিযোগিতায় ইংরেজ এডেন ক্রয় করে নেয়। বিবেকানন্দের এই বিদেশ ভ্রমণকালে ইউরোপের প্রায় সকল দেশই যুদ্ধ-জাহাজের বন্দর ও রসদ সংগ্রহের জন্য এডেন ও নিকটবর্তী রেড-সি-র উপকূল অঞ্চলকে ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করতে থাকে। ইউরোপীয় দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদী লোলুপতা কিরূপ পৃথিবীব্যাপ্ত হয়েছিল তারই একটি সংক্ষিপ্ত অথচ স্পষ্ট চিত্র বিবেকানন্দ তুলে ধরেছেন :

> "ইউরোপের এক টুকরোও কারও নেবার জো নাই; সকলে মিলে তাকে মারবে! আসিয়ায়—বড় বড় বাঘা ভালকো-ইংরেজ, রুষ, ফ্রেঞ্চ, ডচ—এরা আর কি কিছু রেখেছে? এখন বাকী আছে দুচার টুক্‌রো আফ্রিকার। ইতালি সেইদিকে চল্‌লো।"

প্রসঙ্গতঃ রেড্‌-সি দিয়ে জাহাজ যাবার সময় সহযাত্রী পাদ্রী বোগেশের বাইবেল-বিবৃত কাহিনী অবতারণার মধ্যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাসমৃদ্ধ ইংরেজের সংস্কারকে যুক্তিনিষ্ঠ ভাবে বর্ণনা করার নগ্ন প্রচেষ্টার প্রতি বিবেকানন্দ কটাক্ষ করেছেন। বাইবেলে আছে মুসা সদলবলে পদব্রজে রেড্‌-সি অতিক্রম করেন এবং মিসরি

বাদ্সা ফৌজ পাঠিয়ে ঐ পথে তাদের ধরার চেষ্টা করলে দ্বিধা বিভক্ত রেড্-সি পুনরায় সংযুক্ত হয়ে যায়, ফলে মিসরিফৌজ '...কাদায় রথচক্র ডুবে কর্ণের মত আট্‌কে জলে ডুবে মারা যায়।" পাদ্রী বোগেশ্ বাইবেল-বর্ণিত এই কাহিনীকে যুক্তিনিষ্ঠ করে তোলার জন্য এর সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সত্য আরোপ করায় বিবেকানন্দ একান্ত তর্কবিদ্যার (logic) আশ্রয়ে তার বিরুদ্ধতা করেন। বিবেকানন্দের বক্তব্য হল যদি বিজ্ঞানসম্মত হয় তবে দেবতা যিশুর মহিমা অবাস্তব। অবশেষে চাপে পড়ে বোগেশ্ তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাসবোধের প্রসঙ্গ টেনে বিবেকানন্দের নিক্ষিপ্ত যুক্তির হাত থেকে আত্মরক্ষা করেছে। কিন্তু ইউরোপীয়দের অপরের ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীটি সুকৌশলে যুক্তিনিষ্ঠ ভাবেই উন্মোচন করেছেন :

> "তবে ঐ যে একদল আছে—পরের বেলা দোষটি দেখাতে, যুক্তিটি আন্‌তে, কেমন তৈয়ার ; নিজের বেলায় বলে, 'আমি বিশ্বাস করি, আমার মন সাক্ষ্য দেয়'—তাদের কথাগুলো একদম অসহ্য।"

পরস্পর ধর্মবিরোধের মূলে এই সংকীর্ণ দৃষ্টি ও অনুদার মনোভাবের ভূমিকাকেই বিবেকানন্দ এই অংশে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন।

॥ মিসর, আরব ও সুয়েজ -বৃত্তান্ত ॥

রেড্-সি দিয়ে জাহাজ চলবার সময় তীরবর্তী মিসরের দিকে দৃষ্টি পড়তেই বিবেকানন্দের স্মৃতিপটে ভেসে উঠল প্রাচীন মিসরের চিত্র। শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধর্ম, চিকিৎসাবিদ্যা, দর্শন ও স্থাপত্যচর্চার অত্যুন্নত শিখরে এক সময় এই মিসর আরোহণ করেছিল। বর্তমান মিসরের হৃতশ্রীরূপ বিবেকানন্দের অধীতবিদ্যার আলোকে ম্লান হয়ে গিয়ে জেগে উঠল প্রাচীন গৌরব নিয়ে। সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের আলো

ফেলে ফেলে অতীতের গৌরবময় অধ্যায়গুলিকে এক সঙ্গে স্বল্পপরিসর আয়োজনের ভিতর তুলে ধরেছেন। প্রথমেই তাঁর মনে হল তামিল-দের এক শাখা মালাবার উপকূল ধরে মিসরে উপস্থিত হয়ে কি ভাবে সভ্যতার বিস্তার করল ; তারপর সেই সভ্যতা এগিয়ে চলল উত্তর দিকে শক্তিবিস্তার ও রাজ্যবিস্তারের মধ্য দিয়ে। প্রাচীন গ্রীক এদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। এই মিসরের প্রাচীন বাদ্সাহদেরই অপূর্ব কীর্তি পিরামিড। এদের পোশাক-পরিচ্ছদ, অলংকার, সাজ-সজ্জা নিতান্ত পরিপাটি।

আরবের বহু বিখ্যাত বিখ্যাত রাজবংশের উদ্ভব এই মিসরে। এদের সেই প্রাচীন ইতিহাস পাপিরস্ পাতায়, পাথরে, মাটির বাসনের গায়ে চিত্রাক্ষরে বিস্তৃতভাবে লেখা।

প্রাচীন বাদ্সাদের পিরামিড তৈরির মূলে এক অদ্ভুত অধ্যাত্মিক চিন্তা বর্তমান। এরা মনে করত মৃতদেহকে কেন্দ্র করেই সূক্ষ্ম শরীর বিদ্যমান থাকে এবং এই মৃতদেহে আঘাত লাগলে সূক্ষ্ম শরীরও আহত হয়। তাই এত কৌশল ও পরিশ্রম। কিন্তু পরবর্তী মানুষের লোভ ও সংস্কার সেই পিরামিডের অভ্যন্তরে কখনও চৌর্যবৃত্তি রূপে প্রবেশ করেছে, আবার কখনও মৃতদেহকে ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করার জন্য পিরামিডের ধ্বংস-সাধন করতে উৎসাহিত করেছে। আরবের চিকিৎসাশাস্ত্রে ঐ মৃতদেহ থেকেই 'মামিয়া' নামে ঔষধ সৃষ্টি হয়েছে বলে বিবেকানন্দ অনুমান করেছেন।

মৌর্যসম্রাট অশোকের প্রচেষ্টায় মিসরে বৌদ্ধধর্মের প্রসার এবং সেই সঙ্গে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের সেবামূলক চিকিৎসাব্রত পালন, আহার ও জীবন-চর্যায় সংযম, সন্ন্যাসজীবন-পালনে উৎসাহদান প্রভৃতি প্রাচীন লুপ্ত ইতিহাসের তিনি পুনরুদ্ধার করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, যে, বৌদ্ধধর্মের আনুষঙ্গে থেরাপিউট্, অস্সিনি, মানিকি প্রভৃতি যে সম্প্রদায়গুলির সৃষ্টি হয়েছিল, পরবর্তীকালে তাদের ভিতর থেকেই খ্রীষ্টানধর্মের সমুদ্ভব। মিসরের টলেমি

বাদ্‌সাহদের রাজত্বকালে আলকসন্দ্রিয়া নগরী বিদ্যাচর্চার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র হয়ে ওঠে এবং সেখানে বিদ্বজ্জনের সমাবেশ, বিবিধ জ্ঞানগর্ভ পুস্তক রচনা ও বিখ্যাত পুস্তকাগার গড়ে ওঠার যে প্রাচীন তথ্য তিনি বিবৃত করেছেন তা' ইতিহাস-সমর্থিত। পরবর্তী কালে খ্রীস্টানদের বিদ্যা, বিজ্ঞান, যুক্তি-তর্ক-বিরোধী ধর্মীয় গোঁড়ামির জন্য আলকসন্দ্রিয়ার এই সমৃদ্ধি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। হাইপেশিয়ার মত জগৎপ্রসিদ্ধ বিদুষী নারীকে জঘন্য ভাবে হত্যা এই ধর্মীয় গোঁড়ামির একটি নিকৃষ্টতম পরিণতি।

রেড্-সির বাম পার্শ্বস্থ দেশ মিসর এবং দক্ষিণ পার্শ্বস্থ দেশ মরুময় আরব। এই আরব প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ আরববাসীদের দীর্ঘ-দেহী সুঠাম বলিষ্ঠ দৈহিক গঠন-বর্ণনায় সর্বাধিক আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। মরুভূমির প্রচণ্ড রুক্ষতা ও সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপ থেকে শরীরকে রক্ষা করার জন্য এই আরববাসীরা আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত করে রাখে। কিন্তু সেই বস্ত্রাবরণ ভেদ করে তাদের সরল দণ্ডায়মান দেহ ও চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টিতে স্বাধীন সত্তা প্রকটভাবে আত্মপ্রকাশ করে। যখন খ্রীস্টানদের যুক্তিহীন গোঁড়ামি ও জাঠদের বর্বরতা প্রাচীন ইউনান ও রোমান সভ্যতাকে নির্বাপিত করে দিল, ইরানের ক্লেদপঙ্কিল বিলাস-বহুল জীবনচর্চা প্রাধান্য পেল এবং ভারতবর্ষে পাটালিপুত্র ও উজ্জয়িনীর গৌরবরবি রাজন্যবর্গের ক্রূরতা ও অশ্লীল কামচর্চার আবর্জনারাশিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে লাগল তখন এই অখ্যাত অমার্জিত আরবজাতি সমগ্র পৃথিবীব্যাপী আধিপত্য বিস্তারের দুর্বার শপথ নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। পরবর্তীকালে আবরদের দৈহিক গঠনের সেই বলিষ্ঠতা কাফরি, সিদি, হাবসি রক্তের মিশ্রণে অবসিত হওয়ার বৃত্তান্ত-বর্ণনার মধ্যে বিবেকানন্দের ব্যক্তিগত বেদনা-বোধ সঞ্চারিত হয়েছে:

"আর আরবদের সেকাল নেই। ক্রমাগত কাফরি, সিদি,

হাব্‌সি রক্ত প্রবেশ কোরে, চেহারা উদ্যম সব বদ্‌লে দেচে—মরুভূমির আরব পুনর্মূষিক হয়েচেন।"

আরববাসীদের দৈহিক বলিষ্ঠতা যে কি পরিমাণ তাঁকে মুগ্ধ করেছিল তা আরব-বৃত্তান্ত বর্ণনার শেষাংশে সংক্ষিপ্ত বিবৃতির মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। মরুভূমির এই শুষ্ক আবহাওয়া যেমন আরব-বাসীদের দৈহিক বলিষ্ঠতা সঞ্চার করেছে তেমনি মরুভূমিপ্রধান রাজস্থান, মাড়বার অঞ্চলের মানুষ থেকে পশু পর্যন্ত সকলকে সবল ও দীর্ঘদেহের অধিকারী করেছে। পক্ষান্তরে তিনি বাঙলার গরম অথচ জলীয় আবহাওয়ায় বাঙালীর দুর্বল অবসন্ন দেহের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন।

সুয়েজ.রেড্-সি ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্তী একটি খাল. উভয়ের সংযোগ সাধন করছে এবং এখানেই গড়ে উঠেছে সুয়েজ বন্দর। বিবেকানন্দ ১৪ই জুলাই এই বন্দরে এসে উপস্থিত হন। মিসরে প্লেগের প্রাদুর্ভাব এবং জাহাজ-যাত্রী প্রাচ্যবাসীদের শরীরে প্লেগের জীবাণু বহনের আশংকা থাকায় পরস্পরের স্বার্থে মিসরবাসী ও জাহাজযাত্রীদের মেলামেশার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। সুয়েজ খালের বর্ণনা অংশে কল্পনার বৈভব বা পর্যবেক্ষণ শক্তির কোন পরিচয় নেই ; বর্ণনাটি অনেকাংশে বস্তুনির্ভর ও তথ্যধর্মী। বর্তমান সুয়েজ খালের প্রাচীন ভূ-প্রাকৃতিক গঠন ও পরবর্তীকালে এই স্থানের জলপথ রূপায়ণের ইতিবৃত্তান্ত বিবৃত হয়েছে। আধুনিক কালে ফরাসী স্থপতি ফর্ডিনেণ্ড লেসেপ্স-এর প্রচেষ্টায় সুয়েজখাল খননের পূর্বেও প্রাচীন মিসরের ফেরো বাদসাদের উদ্যোগ রেড্-সি ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্তী কতকগুলি লবণাক্ত জলা খাতকে সংযুক্ত করে একটি জলপথ সৃষ্টি সম্পর্কে জানা যায়। পরবর্তী কালে ক্রমান্বয়ে মিসরের রোম শাসক, মুসলমান সেনাপতি অমরু প্রমুখ এই জলপথকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন। সর্বশেষ তুরস্ক সুলতানের প্রতিনিধি মিসরখেদিব ইস্মায়েল ফরাসীদের পরামর্শে ও অর্থ সাহায্যে

খাল খনন করান। এই খাল খনন হওয়ায় সুদূর ভারতবর্ষ থেকে ইউরোপে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় সুবিধা হয়েছে। এই খালের সংকীর্ণতার জন্য জাহাজ চলাচলের অসুবিধা দূর করার বিভিন্ন ব্যবস্থা সম্পর্কেও বিবেকানন্দ পরিদর্শকের বিচক্ষণতা নিয়ে সকল বৃত্তান্ত জানিয়েছেন। এই সংকীর্ণ-খালের মধ্যে অন্যান্য জাহাজ কি ভাবে কোথায় সাময়িক অপেক্ষা করে অপর জাহাজের গমন অথবা নির্গমনের সুযোগ করে দেয়; একটি জাহাজের উপস্থিতিকে কিভাবে পরবর্তী অফিসে জানান হয়—এই সব পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ পরিবেশন করে তিনি পাঠকের চাক্ষুস করার অভাব মেটাতে চেষ্টা করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর রাজনৈতিক মীমাংসায় সুয়েজ খালের উপর ফরাসী কর্তৃত্ব থাকা সত্ত্বেও কিভাবে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে সংবাদটুকুও তিনি পাঠককে জানাতে ভোলেননি।

সুয়েজ খালের বৃত্তান্ত জ্ঞাপনের অবকাশে ভারতবর্ষের সঙ্গে বহির্বিশ্বের যোগাযোগ ও ভারতের পণ্যদ্রব্যে বিশ্বের সমৃদ্ধি অর্জনের প্রাসঙ্গিক আলোচনা-অংশটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতের সঙ্গে বহির্বিশ্ব দুটি পথে বাণিজ্যের স্বার্থে যোগাযোগ করত—একটি স্থলপথে আফগানিস্থান ও ইরাণ হয়ে অপরটি জলপথে রেড্ সির ভিতর দিয়ে। সিকন্দর সা ইরাণ-বিজয়ের পর তাঁর সেনাপতি নিয়ার্কুসকে জলপথে সিন্ধুনদের মুখ হয়ে লোহিত সমুদ্র দিয়ে ভারতে প্রবেশের রাস্তা অনুসন্ধানের জন্য পাঠান। পরবর্তী কালে বাবিল ইরাণ গ্রীস রোম প্রভৃতি প্রাচীন দেশের ঐশ্বর্য ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যসূত্রে বৃদ্ধি পায়। রোম ধ্বংসের পর বোগদাদ, ইতালী, ভিনিস্, জেনোয়া, ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়। পোর্তুগীসরা আফ্রিকা পরিক্রমা করে জলপথে ভারতে প্রবেশের পথ আবিষ্কার করলে ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ ক্রমে ক্রমে ভারতে উপস্থিত হয় এবং ভারতীয় পণ্যে নিজের নিজের দেশকে সমৃদ্ধ করে।

পাশ্চাত্যের সভ্যতাবিস্তার ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধির মূলে ভারতবর্ষের অশেষ ভূমিকার কথাই বিবেকানন্দ এই অংশে বিবৃত করতে চেয়েছেন। অতি আধুনিক কালে সুয়েজ খালের মাধ্যমে ভারতবর্ষ ও ইউরোপের সম্বন্ধ নিকটতর হওয়ার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রাচীনকালে এই যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও ভারতের পণ্যে পাশ্চাত্যের শ্রীবৃদ্ধির কথা অনিবার্যভাবেই এসে গেছে।

॥ ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশগুলির প্রাচীন পরিচয় ॥

ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশগুলির বর্ণনা মূলতঃ ইতিহাস-নির্ভর। এই সকল দেশগুলির রাজতন্ত্রের উত্থান-পতন, সংস্কৃতি ও সভ্যতার পূর্ব-ঐতিহ্য রোমন্থন, পৌরাণিক তথ্যচর্চা, ধর্মবিস্তারে প্রতিযোগিতা প্রভৃতি প্রাধান্য পেয়েছে। চোখে দেখা অপেক্ষা অধীত-বিদ্যার পুনরালোচনাতেই বিবেকানন্দের লেখনী এই অংশে অধিকতর তৎপর হয়ে উঠেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার এই প্রাচীন লীলাক্ষেত্রের নিকটবর্তী হওয়ায় তাঁর এতদিনের অধ্যয়নও অনুশীলন যেন কথা কয়ে উঠতে চাইল। ভারতের বাইরে সভ্যতার এই দ্বিতীয় মহাকেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে এমন বিস্ময়-বিহ্বল হয়ে পড়েছেন যে, কতটুকু বলবেন এবং কতটুকু বলবেন না তার মাত্রা রক্ষা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তাই এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে বহু বৃত্তান্তকে সাংবাদিকসুলভ সমাচারধর্মী বর্ণনাতে পরিণত করেছেন। ৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দে গথ, ভ্যাণ্ডাল প্রভৃতি বর্বরদের দ্বারা রোমানসাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ থেকে ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলের পতন পর্যন্ত ইউরোপীয় ইতিহাসের মধ্যযুগ এবং পরবর্তীকালে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার কিভাবে সমগ্র ইউরোপকে প্রভাবিত ও উন্নত করেছিল, সেই বিস্তৃত ইতিহাসকে

স্বল্প পরিসরের মধ্যে বর্ণনা করে তিনি সমগ্রতার স্বাদ পাঠকের কাছে এনে দিয়েছেন। এ যেন ভাণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড দর্শনের মত।

আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার পীঠস্থান এই ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল। এই সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে প্রাচীন মিসর, ফিনিসিয়া, ফিলিষ্টিন, বাবিল, আসীর, ইরাণী সভ্যতার সংমিশ্রণে। কিন্তু এই সভ্যতার পশ্চাতে গ্রীকজাতির দান সর্বাপেক্ষা। প্রাচীন ও মধ্য-যুগীয় ইউরোপীয় সভ্যতা; যা আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার জনকত্বের দাবী রাখে সেই লুপ্ত ইতিহাস কি ভাবে উদ্ধার হয়েছে বিবেকানন্দ তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন। পুরানো পাথর, ভাঙা বাড়ি-ঘর, শিলালিপি, প্রাচীন পুথি প্রভৃতি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, প্রাচীন লুপ্ত-প্রায় ইতিহাস কিভাবে উদ্ধার করতে সহায়তা করেছে তাও বলেছেন। এই ভূমধ্যসাগর-তটস্থ প্রাচীন সভ্যতা যা আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি, তার মূলে আছে সেমিটিক জাতিবর্গ ও ইবাণী, যবন, রোমক প্রভৃতি আর্যজাতির সংমিশ্রণ।

প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থান কনস্টান্টিনোপল থেকে সভ্যতা কি ভাবে সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ল তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় তিনি দিয়েছেন। তুর্কী মুসলমাননেতা ওস্মান ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ করলে ঐ অঞ্চলের গ্রীক পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁদের পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত জ্ঞান-বিজ্ঞানসমৃদ্ধ পুথিপত্র নিয়ে পশ্চিম ইউরোপের দিকে প্রাণভয়ে পলায়ন করে এবং এই সুত্রে ইংরেজ, জার্মাণ, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশবাসীর ভিতর আধুনিক সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। প্রাচীন রোমক-সভ্যতাও এই গ্রীকদের কাছে ঋণী। এমন কি গ্রীকরা খ্রীষ্টানধর্ম গ্রহণ করায় এবং গ্রীকভাষায় খ্রীষ্টান-ধর্ম লিখিত হওয়ায় সমগ্র রোমসাম্রাজ্যে খ্রীষ্টান ধর্মের জয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিহাস অনুসরণ করলে লক্ষ্য করা যায় যে, গ্রীক সভ্যতা খ্রীষ্টানদের সভ্যতার বহু পূর্ববর্তী। বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে

তিনি বলেছেন যে, গ্রীকরা খ্রীষ্টানধর্ম অবলম্বন করায় তাদের পূর্বের সেই বিদ্যা-বুদ্ধি বহুলাংশে লোপ পেয়েছে।

ভূমধ্যসাগরের তটভূমিস্থ অধিবাসীরা প্রাচীন মানবগোষ্ঠীর কোন কোন শাখায় বিভক্ত সে সম্পর্কে পরিচয় দিতে গিয়ে স্বামীজী বলেছেন : মিসর, বাবিল, ফিনিক, য়াহুদি প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষ সেমিটিক জাতিবর্গের অন্তর্গত এবং ইরাণী, যবন রোমক প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসী আর্যজাতির অন্তর্ভুক্ত। সেমিটিক জাতিবর্গের অন্তর্গত মানুষের দৈহিক গঠন ও আর্যজাতিভুক্ত মানুষের দৈহিক গঠন বর্ণনা সূত্রে বলেছেন ; প্রথম শ্রেণীর রঙ্ সাদা, চোখ সোজা, নাক কান একটু বাঁকা এবং প্রান্তভাগ একটু মোটা, কপাল গড়ানে, ঠোঁট পুরু ; দ্বিতীয় শ্রেণীর নাক মুখ-চোখ সোজা, রঙ্ সাদা, চুল কালো বা কটা, চোখ কালো বা নীল বর্ণের। এই উভয় জাতির সংমিশ্রণে বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছে।

ইউরোপীয় সভ্যতাগঠনের মূলে যে সকল দেশের দান বেশি তাদের মধ্যে মিসরী ও য়াহুদি (ইহুদী) অন্যতম। তিনি এই দুই জাতির প্রাচীন পরিচয় স্বল্পপরিসর সুযোগের মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। আয়োজন যদিও সংক্ষিপ্ত তথাপি এর মধ্যে তাঁর গভীর ইতিহাস-জ্ঞান স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মিসর সম্পর্কে পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, 'রোজেট্টা ষ্টোন' নামে প্রাপ্ত এক বৃহৎ শিলালেখে জীবজন্তুর লাঙ্গুলাকৃতি দুর্বোধ্য চিত্রলিপি ও গ্রীক ভাষার অনুযায়ী এক লিপি এবং মিসরের বিভিন্ন অঞ্চলের মন্দির, স্তম্ভ, শবাধার ইত্যাদিতে ক্ষোদিত লিপির পাঠোদ্ধার করে মিসরতত্ত্ব সম্পর্কে পণ্ডিতরা অবহিত হয়েছেন। এই বৃত্তান্ত থেকে জানা যায়, 'পুন্ট' নামক দক্ষিণদেশ থেকে দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত এক জাতি মিসরে এসে উপস্থিত হয়। কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেন এই 'পুন্ট' বর্তমান মালাবার। এদের প্রথম রাজার নাম 'মেনুস' এবং ধর্মের দিক থেকে বাঙলার

পৌরাণিকতার কাছাকাছি। 'শিবু' দেবতা ও 'মুই' দেবী এই আকাশ, পৃথিবী প্রভৃতির স্রষ্টা বলে এদের পৌরাণিক অভিমত। মিসরের নীলনদের সঙ্গে আকাশের কাল্পনিক নীলনদের যোগাযোগ এবং সেই নদীতে সূর্যের নৌকায় করে পরিক্রমা ও 'অহি' নামক সর্পের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় গ্রহণ হওয়া, শূকরের আক্রমণে চন্দ্রের খণ্ডিত হওয়া এবং পনের দিনে পুনরায় সংযুক্ত হয়ে পূর্ণ আকৃতি গ্রহণ করা প্রভৃতি হিন্দু পুরাণকথার মত মিসরের পৌরাণিক বৃত্তান্ত।

ইউফ্রেটিস নদীর তীরে যে সভ্যতার জন্ম হয়েছিল, তাদের মধ্যে 'বাল', 'মোলখ', 'ইস্তারত', 'দমুজি' প্রধান। এই সভ্যতার সঙ্গেও পৌরাণিক ইতিবৃত্তান্ত জড়িত আছে এবং বিবেকানন্দ সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ দৃষ্টি নিয়েই বলেছেন, সমগ্র সেমিটিক জাতির ধর্ম সামান্য প্রকার-ভেদে প্রায় এক রকম। বাবিল, য়াহুদি, ফিনিক ও পরবর্তী আরবদের উপাসনারীতি প্রায় একই রকম। এদেরই 'আলাৎ' দেবতা পরবর্তীকালে মুসলমানের 'আল্লা'য় রূপান্তরিত হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। খ্রীস্টধর্মগ্রন্থ বাইবেলের রচনা সম্পর্কে তিনি সাধারণ পাঠকের কাছে বহু অজ্ঞাত তথ্য জানিয়েছেন, তবে এই তথ্যগুলি পূর্ববর্তী বিশ্লেষক ও বিচক্ষণ পণ্ডিতদের অভিমতের অনুযায়ী। বাইবেলের রচনাকাল খ্রীস্টপূর্ব ৫০০ অব্দ থেকে খ্রীস্ট-পরবর্তী কাল এবং বাবিল জাতির পৌরাণিক সৃষ্টি বর্ণনা, জলপ্লাবন-বর্ণনা: পারসীদের পরলোকবাদ, মৃতের পুনরুত্থান, শয়তানবাদ প্রভৃতি বাইবেলে স্থান পেয়েছে। খ্রীস্টানধর্মের উদ্ভব সম্পর্কে য়াহুদিদের প্রাচীন ধর্মাচরণের প্রসঙ্গ অনিবার্য ভাবেই উত্থাপিত করেছেন; কারণ এই য়াহুদিদের নৃত্যগীতময় সাধন-পদ্ধতির অনুগামী 'নবী বা Prophet (ভাববাদী)' -সম্প্রদায় খ্রীস্টানধর্মের স্রষ্টা। খ্রীস্টান মহাপুরুষ ঈশা ও নিউ টেস্টামেন্টের চারটি পুস্তকের অর্বাচীনত্ব সম্পর্কে য়াহুদি ঐতিহাসিক জোসিফুস ও ফিলো যে সংশয় প্রকাশ করেছেন, বিবেকানন্দ সে সম্পর্কেও প্রাচীন তথ্যের পুনরুল্লেখ

করেছেন। এই সকল তথ্য থেকে জানা যায় যে, রোমকরা যে সময় য়াহুদিদের উপর রাজত্ব করতেন এবং গ্রীকরিস্থা তাদের মধ্যে প্রচার করতেন সেই সময়ের য়াহুদি সম্পর্কে বহু কথা লিপিবদ্ধ করা হয়, কিন্তু ঈশা বা ক্রিশ্চান সম্পর্কে কোন কথা জানা যায় না। নিউ টেষ্টামেণ্টের বহু উপদেশ য়াহুদিদের মধ্যে পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল। পাশ্চাত্যদেশীয় এই সকল ধর্ম ও পুরাণকথার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে স্বামীজী বাঙলা ভাষায় দেশীয় ইতিহাসের দীনতা সম্পর্কে তাঁর অন্তর্বেদনাকে প্রকাশ করেছেন :

> "আমাদের বাঙলা ভাষায় কিছুই নাই। হবে কি করে?—এক বেচারা ১০ বৎসর হাড়গোড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে যদি এই রকম একখানা বই তর্জমা করে তো সে নিজেই বা খায় কি, আর বই বা ছাপায় কি দিয়ে?"

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইতিপূর্বে বাঙলার ইতিহাসের অভাব সম্পর্কে তাঁর রচনায় নিজের হৃদয়-বেদনাকে ব্যক্ত করেছেন :

> "সাহেবেরা যদি পাখী মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাঙলার ইতিহাস নাই।"[১]

॥ ফ্রান্স ও জার্মানি ॥

শিল্পকলা, স্থাপত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতির মহান্ ঐতিহ্যমণ্ডিত দেশ ফ্রান্স এবং ফ্রান্সের অনুকরণ ও অনুসরণে নির্মিয়মান দেশ জার্মান—এই উভয় দেশের তুলনামূলক আলোচনায় বিবেকানন্দের লেখনী অদ্ভুত বর্ণনা-চাতুর্য এবং সার্থক উপমাচয়নের উন্মাদনায় যেন মেতে উঠেছে। ব্যাপ্ত অভিজ্ঞতাকে স্বল্পপরিসর আয়োজনে এমন সংহত ভাষায় বর্ণনার মধ্যে সমগ্রতার স্বাদ এনে দিয়েছেন যে, এই অংশ পড়লে তাঁকে একজন প্রথম শ্রেণীর প্রাবন্ধিক না বলে উপায় নেই।

১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বিবিধ প্রবন্ধের অন্তর্গত 'বাঙ্গালার ইতিহাস'।

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের গুণিজনসঙ্গলাভ ও প্যারিসের ঐতিহ্যকে কাব্যকথার আশ্রয়ে বর্ণনায় চমৎকারিত্ব সম্পাদন করেছেন ঃ

"সে পর্বতনির্ঝরবৎ কথাচ্ছটা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ চতুর্দিক-সমুত্থিত ভাববিকাশ, মোহিনী সঙ্গীত, মনীষি-মনঃ সংঘর্ষ-সমুত্থিত চিন্তা-মন্ত্রপ্রবাহ সকলকে দেশকাল ভুলিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত!"

শিল্প, শিল্পী, বিদ্যা ও বিদ্বান্-সমাচ্ছন্ন প্যারিসের অন্তরালে ইন্দ্রিয়-বিলাসের স্রোত প্রবাহিত দেখে তিনি এই খ্যাতির অবসান-আশংকায় গভীর বেদনা অনুভব করেছেন এবং তাঁর প্যারিসে অবস্থিতিকালে মেঘাচ্ছন্ন বর্ষণমুখর আকাশে সূর্যের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করে তিনি আন্তরিক বেদনাবোধ থেকেই মন্তব্য করেছেন যে,

"...ইন্দ্রিয়-বিলাসের স্রোত দেখে ঘৃণায় সূর্যের মুখ মেঘকলুষিত হয়েছে, অথবা কাষ্ঠ বস্ত্র ও নানারাগরঞ্জিত এ মায়া অমরাবতীর আশুবিনাশ ভেবে তিনি দুঃখে মেঘাবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকলেন।"

২৪শে অক্টোবর সন্ধ্যায় প্যারিস পরিত্যাগ করে পরের দিন প্রভাতে বিবেকানন্দ জার্মানে উপস্থিত হয়ে ফরাসী অনুকরণের স্পষ্ট প্রমাণ সেখানে লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু অনুকরণ-প্রচেষ্টায় সামঞ্জস্য অপেক্ষা অসামঞ্জস্যই তাঁর দৃষ্টির পক্ষে পীড়াদায়ক ঠেকেছে। জার্মানের নতুন আত্মপ্রকাশ ও ফ্রান্সের অপস্হয়মাণ ঐতিহ্য—এই দুটি-ই তিনি লক্ষ্য করেছেন ঃ

"...এক দিকে ভুবনস্পর্শী ফ্রান্স, প্রতিহিংসানলে পুড়ে পুড়ে আস্তে আস্তে খাক হয়ে যাচ্ছে ; আর একদিকে কেন্দ্রীকৃত নূতন মহাবল জার্মানি মহাবেগে উদয়শিখরাভিমুখে চলেছে।"

শিল্প-সভ্যতায় ফ্রান্সের প্রাণকেন্দ্র প্যারিসের অনুকরণ-প্রচেষ্টা জার্মান সমেত সমগ্র পাশ্চাত্য দেশেই চলছে, কিন্তু সে অনুকরণ নিতান্তই স্থূল। ফ্রান্স সম্পর্কে অভিভূত হয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন যে, ফরাসী প্রতিভার ক্রোধান্ধ মুখমণ্ডল যেমন সুন্দর, 'সভ্যতা স্নায়ুময় কর্পূরের

মতো, কস্তুরীর মতো' তেমনি বিপরীত ক্ষেত্রে জার্মান প্রতিভার মধুর হাস্যাননও ভয়ঙ্কর ; জার্মান-সভ্যতা পেশীময় সীসার মতো। ফরাসী ও জার্মানের স্থাপত্য-কীর্তির তুলনামূলক আলোচনায় বলেছেন যে, ফরাসী অনুকরণে নির্মিত জার্মানের সুসজ্জিত প্রাসাদগুলি হস্তি বা উটের আবাসের মতো এবং ফ্রান্সের যথার্থ পশুগৃহগুলিও যেন পরীর বসবাসের মতো সুদৃশ্য।. তবে জার্মানিদের অধ্যবসায় ও কর্মশক্তির তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। সুদূর আমেরিকায়ও এই জার্মানিরা অনুপ্রবেশ করেছে এবং সৈন্যগঠনে, যুদ্ধজাহাজ নির্মাণে, পণ্যপ্রস্তুতে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। পণ্যপ্রস্তুতে ইংরেজের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে জার্মান তার একাধিপত্যকে খর্ব করেছে ; এবং ইংলণ্ডের উপনিবেশগুলিতে পর্যন্ত জার্মান-পণ্য প্রবেশ করেছে।

॥ অস্ট্রিয়া ও হুঙ্গারি ॥

বিবেকানন্দ যখন অস্ট্রিয়া পরিদর্শন করেন তখন অস্ট্রিয়ার হতশ্রী ও হতমান অবস্থা। এই অস্ট্রিয়া দীর্ঘকাল সমগ্র জার্মানের উপর প্রভুত্ব করে এসেছে এবং এদের রাজবংশের গৌরবও ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা করে এসেছে। সেই ঐতিহ্যমণ্ডিত অস্ট্রিয়ার পূর্ণগৌরব ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসে—প্রুশিয়া, অস্ট্রিয়া ছাড়া সমগ্র জার্মানের উপর আধিপত্য স্থাপন করে। গৌরবময় প্রাচীন ইতিবৃত্ত বর্ণনার পাশাপাশি বর্তমান অবস্থার চিত্রটি তুলে ধরায় অস্ট্রিয়ার সৌভাগ্যসূর্যের উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত রূপটি ইতিহাস-অনভিজ্ঞ পাঠকের কাছেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রাথমিক ভাবে ইতালীর নব-অভ্যুত্থানের কথা বলতে গিয়ে তিনি পতনের সম্ভাবনা কোন্ পথে অনিবার্য হয়ে উঠবে তাও ইঙ্গিত দিয়েছেন। অস্ট্রিয়ার দুর্লভ পারিবারিক মর্যাদার অংশীদার হবার জন্য নেপোলিয়ানের করুণ

প্রয়াস এবং তার ততোধিক করুণ পরিণতির কথাও বিবেকানন্দ বিবৃত করেছেন। অস্ট্রিয়া-সম্রাট শাসিত হুঙ্গারি সম্পর্কে বর্ণনা-অংশ খুবই সামান্য, কারণ অস্ট্রিয়ার পক্ষচ্ছায়ায় দীর্ঘকাল আশ্রিত ও সদ্য মুক্ত হুঙ্গারি নিজস্ব গৌরবে তখনও আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। অস্ট্রিয়ার পূর্বগৌরব বর্ণনা ও বর্তমান হীনাবস্থার শোচনীয় রূপটিই এই অংশে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

সমগ্র জার্মানে অস্ট্রিয়ার একাধিপত্যের দিন অবসিত হয়েছে। অস্ট্রিয়ার রাজবংশ হ্যাপসবর্গ বংশ, ইউরোপের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও অভিজাত রাজবংশ। সে গৌরববোধ ও মান বিদ্যমান থাকলেও এখন সে শক্তিহীন। অস্ট্রিয়ার রাজপরিবার ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তাদের সাম্রাজ্য পবিত্র রোমসাম্রাজ্য নামে অভিহিত হত। পোপ ছিল এই পরিবারের ধর্মগুরু। কিন্তু নবোদ্ভূত ইতালী পোপের ঐশ্বর্য, রাজ্যই কেবল কেড়ে নেয়নি ; পোপের রাজধানী রোম. ইতালীর রাজধানীতে পরিণত হয়। পোপ-সহায় অস্ট্রিয়ার বহুকালব্যাপী দাসত্বের বিরুদ্ধে নব্য-ইতালীর অভ্যুত্থান ঘটে। ইংল্যাণ্ডের কুপরামর্শে নবীন ইতালীর সৈন্যবল বৃদ্ধি, রণপোত সংগ্রহ ; আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবিস্তারের প্রচেষ্টাকে ধ্বংসমুখী বলে স্বামীজী অভিহিত করেছেন।

অস্ট্রিয়ার রাজবংশের মর্যাদাবোধের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, *বিবাহ ব্যাপারে এরা নিতান্ত সতর্ক—ক্যাথলিক পরিবার ভিন্ন অন্য কারুর সঙ্গে এরা সম্পর্ক স্থাপন করে না। নেপোলিয়ান এই দুর্লভ বংশমর্যাদা অর্জনের জন্যই অস্ট্রিয়-সম্রাটের কন্যাকে* বিবাহ করেন। কিন্তু রক্ষণশীল অস্ট্রিয় রাজবংশ নোপোলিয়নকে কোনদিন নিজ পরিবারের মর্যাদা দেননি এবং নেপোলিয়ানের অবর্তমানে তাঁর শিশুপুত্রের মধ্যে যাতে পিতৃগৌরব সঞ্চারিত না হয় সেজন্য সতর্ক প্রহরাধীনে এই শিশুপুত্রকে রক্ষা করা হয়। নেপোলিয়ানের কয়েকজন পুরাতন সৈনিক কৌশলে এই শিশুর

রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়ে তার অন্তরে পিতৃগৌরব জাগিয়ে তুলে অস্ট্রিয়ার সানব্রান-প্রাসাদ ত্যাগের চেষ্টা করলে ধরা পড়ে এবং ভগ্ন হৃদয়ে নেপোলিয়ান-পুত্রের প্রাণবিয়োগ ঘটে। অস্ট্রিয়ায় অবস্থান-কালে সানব্রান-প্রাসাদ পরিদর্শন করতে গিয়ে তিনি এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। তিনি লক্ষ্য করেন, কোন ফরাসী ফরাসিনী সানব্রান-প্রাসাদের রক্ষীর কাছে নেপোলিয়ান-পুত্রের অবস্থান-কক্ষ সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করলে রক্ষী তার অজ্ঞতাই কেবল জানায় না, ফরাসীদের সম্পর্কে মনে মনে ঘৃণাও জানায়। কারণ, অস্ট্রিয়া নেপোলিয়ান-পুত্রকে কোন দিনও রাজকীয় মর্যাদা দিয়ে জনসমাজে প্রচার করেনি; তাই সে সাধারণ অস্ট্রিয়বাসীর কাছে অপরিচিত। নেপোলিয়ানের অস্ট্রিয়-রাজকন্যাকে বলপূর্বক বিবাহ ব্যাপারটাই তাদের দৃষ্টিতে অমার্জনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হয়েছে।

অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা শহরের মিউজিয়মে মৃত জীবের অস্থি সংগ্রহ এবং ওলন্দাজ চিত্রকরদের আঁকা চিত্র সংগ্রহের তিনি উল্লেখ করেছেন। সর্বশেষ তিনি অস্ট্রিয়ার ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্পর্কে বলেছেন যে, বর্তমান অস্ট্রিয়-সম্রাটের মৃত্যুর পর জার্মান অস্ট্রিয়ার এই অবশিষ্ট অংশকে গ্রাস করবে; জার্মান-শত্রু রুশ যাতে কার্যকর কোন বাধা সৃষ্টি না করতে পারে তার জন্য জার্মান ইতিমধ্যেই রুশবিরোধী তুর্কের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করছে।

হুঙ্গারি সম্পর্কে স্বামীজী খুবই সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়েছেন। হুঙ্গারির অধিবাসী অস্ট্রিয় সম্রাটের প্রজা, কিন্তু অস্ট্রিয়ার সম্রাট হুঙ্গারিতে রাজা বলে অভিহিত হন। হুঙ্গারির প্রাচীন পরিচয় সম্পর্কে বলেছেন যে, এরা তুর্ক-বংশোদ্ভূত কিন্তু ধর্মে ক্রিশ্চান, এবং কাম্পিয়ান হ্রদের উত্তর দিয়ে ইউরোপে প্রবেশ করছে। তুর্করক্তের যুদ্ধপ্রিয়তা এদের মধ্যে বিদ্যমান, তাই অস্ট্রিয়ার কবলমুক্ত হবার জন্য এরা ক্রমাগত যুদ্ধ করে চলছে এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্ক নামমাত্র। স্বামীজী এদের রাজধানী বুডাপেস্ত শহরের পরিচ্ছন্নতা এবং

হুঙ্গার জাতির আনন্দমুখর সঙ্গীতপ্রিয়তার উল্লেখ করেছেন। সমগ্র ইউরোপে ইন্দো-ইউরোপীয়ান-গোষ্ঠীর বাইরে সংস্কৃতসমধর্মী ভাষাগোষ্ঠী-বিরোধী ভাষায় যে অল্প কয়েকটি জাতি কথা বলে হুঙ্গারিয়ানরা তাদের অন্যতম।

॥ তুরস্ক ॥

যাযাবরবৃত্তি ছিল যাদের জীবিকা, স্থায়ী বাসস্থান গঠন ছিল যাদের স্বভাববিরুদ্ধ, সেই তুর্কীজাতি এশিয়া এবং ইউরোপের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে কি ভাবে তাদের সাম্রাজ্য গঠন করল তারই প্রাচীন ইতিহাসকে বিবেকানন্দ তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণনার দ্রুততার সঙ্গে সমন্বিত করে পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন। মাত্রাবোধ বজায় রেখে গুরুত্ব অনুযায়ী বর্ণনায় তিনি নিজের যোগ্যতাকে সার্থক ভাবে প্রমাণিত করেছেন। ভ্রমণের ধর্ম যেমন দ্রুততা ও উদ্দেশ্য যেমন লক্ষ্যে পৌঁছানো, ভ্রমণবৃত্তান্ত উপস্থাপনায়ও সেই দ্রুততা বজায় রেখেও তিনি স্থির লক্ষ্যে পৌঁছেছেন। নদীর সংগম থেকে উৎস দর্শনের মতো তুরস্কের হৃতগৌরবের পর্যালোচনা থেকে ঐশ্বর্যময় যুগ পর্যন্ত এক দৃষ্টিতে তিনি সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণ করেছেন।

তুরস্কের সদ্য-কবলমুক্ত সর্বিয়া, বুলগেরিয়া সম্পর্কে প্রথম আলোচনায় সূত্রপাত করেছেন। ফরাসী, জার্মান, ইংরেজ প্রভৃতি সংস্কৃত, মার্জিত ইউরোপীয় দেশগুলির তুলনায় সর্বিয়া, বুলগেরিয়া নিতান্ত অসভ্য ও অভাবগ্রস্ত দেশ। বাড়ি-ঘর, পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে দৈন্যের ছাপ স্পষ্ট। ধর্মগত পরিচয়ে এরা যে খ্রীষ্টান তা' বোঝবার কোন বিশেষ উপায় নেই, তবে যে পরিচয়ে বোঝা যায় সে সম্পর্কে বিবেকানন্দের অভিমতটি বেশ পরিহাসপূর্ণ; 'আবার ক্রিশ্চান কিনা—দু-চারটা শুয়োর অবশ্যই আছে'। তুর্কের দাসত্ব-মুক্ত এই অঞ্চল দুটির ফৌজগঠনের তৎপরতা প্রসঙ্গ উল্লেখ করে

বিবেকানন্দ তৎকালীন ইউরোপীয় দেশগুলির পররাজ্যগ্রাসের নগ্ন লোলুপতাকেই ব্যক্ত করেছেন। তবে পরবর্তী কালে রুশ-কবলিত হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন তা' সত্যে প্রমাণিত হয়েছে। দেশের অভাব-অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও ফৌজগঠনের অর্থব্যয়কে তিনি সমর্থন করেছেন, কারণ তাঁর অভিমত হল স্বাধীনতার স্বাদ অভাবের তিক্ততাকে ভুলিয়ে দেয়। পরাধীন ভারতবাসী হিসাবে তাঁর এই উপলব্ধি অনুকূল পরিবেশেই স্ফুরিত হয়েছে :

> "স্বর্ণশৃঙ্খলযুক্ত গোলামির চেয়ে একপেটা ছেড়া ন্যাকড়া-পরা স্বাধীনতা লক্ষগুণে শ্রেয়ঃ। গোলামের ইহলোকেও নরক, পরলোকেও তাই।"

তাঁর স্বাধীনতাকামী অন্তর এদের ভুলেভরা কর্মোদ্যমকেও প্রশংসা জানিয়েছে। স্বদেশের স্বাধীনতা-স্বপ্ন তাঁর অন্তরে কি ভাবে জাগরূক ছিল তা' এই প্রসঙ্গে প্রকাশ হয়ে পড়েছে :

> "ইউরোপের লোকেরা ঐ সর্বিয়া বুলগার প্রভৃতিদের ঠাট্টা বিদ্রূপ করে—তাদের ভুল অপারগতা নিয়ে ঠাট্টা করে। কিন্তু এতকাল দাসত্বের পর কি একদিনে কাজ শিখতে পারে? ভুল করবে বইকি—দু'শ করবে; ক'রে শিখবে, শিখে ঠিক করবে। দায়িত্ব হাতে পড়লে অতি-দুর্বল সবল হয়, অজ্ঞান বিচক্ষণ হয়।"

প্রাচীন ইতিহাসের পৃষ্ঠা অনুসরণে তুর্কী জাতির সামগ্রিক পরিচয় উদ্ধার প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ জানিয়েছেন যে, হিমালয় ও হিন্দুকুশ পর্বতের উত্তরে তুর্কী জাতির আদি বাসস্থানের নাম 'চাগওই'। দিল্লীর মোগলবাদশাহ-বংশ, পারস্যরাজবংশ, কনষ্টান্টিনোপল অধিপতি, হুঙ্গারিয়ান জাতি—এই চাগওই তুর্কী বংশোদ্ভূত। এই তুর্কীরা ছিল যাযাবর শ্রেণীর, পালিত গবাদি পশুর খাদ্য অন্বেষণের জন্য দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াত। এদের বংশধরদের অনেকে

বর্তমানেও মধ্য-এশিয়ার কোন কোন অঞ্চলে অনুরূপ জীবন-যাপন করে। এই তুর্কী জাতির মধ্যে ধীরে ধীরে আর্য ও সেমিটিক রক্ত প্রবেশ করে এবং স্বভাবধর্মে এরা যুদ্ধপ্রিয়। অতি প্রাচীনকাল থেকে এই জাতি ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তস্থ দেশগুলিতে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। এই সময় এরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিল, অথবা ভারতবর্ষে আগমনের পর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাসে হুষ্ক, যুষ্ক, কনিষ্ক নামে তিন প্রসিদ্ধ তুরস্ক সম্রাটের কথা আছে; এই কনিষ্ক 'মহাযান' নামে বৌদ্ধধর্মের শাখাকে উত্তরাপথে প্রতিষ্ঠিত করে। পরবর্তী কালে এরা মুসলমানধর্ম গ্রহণ করে এবং লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য যে, মুসলমানধর্ম গ্রহণের পূর্বে এরা যে দেশ জয় করত সেই দেশের সভ্যতা বিদ্যা স্বীকরণ করত ও অধিকৃত অন্য দেশে তা' প্রচার করত, কিন্তু মুসলমান হওয়ার পর এদের যুদ্ধপ্রিয়তাই প্রাধান্য পায় এবং সভ্যতা আকর্ষণের পরিবর্তে অধিকৃত দেশের সভ্যতাকে এরা ধ্বংস করত। বিবেকানন্দ এরই সমর্থনে বলেছেন আফগান, গান্ধার প্রভৃতি দেশে এদের পূর্বপুরুষরা যে অনিন্দ্যসুন্দর স্থাপত্য-কীর্তির নিদর্শন মঠ, মন্দির, স্তূপ নির্মাণের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা করে, পরবর্তী মুসলমান-বংশধরেরা তাকে কেবল ধ্বংসই করেনি বরং মানুষের সৃষ্টি বলে স্বীকার না করে কুসংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে জিন প্রভৃতি অপদেবতার সৃষ্টি বলে অভিহিত করে। এর মধ্য দিয়ে একটি জাতির অবনতিকেই বিবেকানন্দ স্পষ্ট করে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তুর্কীর বর্বর আক্রমণে সভ্যতার শৈল-শিখরে প্রতিষ্ঠিত কনস্টান্টিনোপল সাম্রাজ্যের পতনের মধ্যে দিয়ে এই জাতির মানসিক সংকীর্ণতার এক নগ্ন পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। আবার হিন্দুভাব ও রক্ত সংমিশ্রণের ফলে এদেরই আর এক শাখা. ভারতের মোগলরা সভ্যতা-সংস্কৃতিকে রক্ষা ও পুষ্টিসাধন করেছে।

তুর্কী জাতির প্রাচীন ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, এরা সর্পপূজায় বিশ্বাসী ছিল। পরবর্তীকালে ক্রমান্বয়ে

বৌদ্ধ, মুসলমান, ক্রিশ্চান প্রভৃতি ধর্মান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও এদের বর্তমান মুসলমান ও ক্রিশ্চান শাখায় সেই নাগপূজা-স্তর ও বৌদ্ধ-স্তরের অনেক লক্ষণ বিদ্যমান।

বিবেকানন্দ এশিয়া ও ইউরোপের যে অঞ্চল ও জাতিবিশেষের পরিচয় ভ্রমণবৃত্তান্ত-বর্ণনার সঙ্গে সমন্বিত করেছেন তাতে পরিব্রাজকের চোখ দিয়ে যেমন বর্তমান বিশ্বের স্বরূপদর্শনের সুযোগ ঘটেছে; তেমনি প্রাচীন ইতিহাস রোমন্থনের মধ্যে দিয়ে তিনি পাঠকের মানস-দর্শনের ও সুযোগ করে দিয়েছেন। ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠ ও ইতিহাসপাঠ দুই-ই মূলতঃ মানস-দর্শন—তফাৎ, একটি বর্তমান অন্যটি অতীত। তবে বর্ণনা-কৌশল ও পারম্পর্য জ্ঞানের জন্যই বিবেকানন্দের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ও ইতিহাস-কথা দু'য়ে মিলে একটি সমগ্রতা লাভ করেছে। সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং সামগ্রিক ভাবে মানব-গোষ্ঠীগুলির ক্রমোন্নতি ও ক্রমাবনতির একটি ধারাবাহিক বর্ণনার মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দ অতীত ও বর্তমানের একটি যোগসূত্র ঘটিয়েছেন। এই যোগসূত্র হল, বর্তমান বস্তু অথবা ব্যক্তি আপন অঙ্গে অতীতের যে লক্ষণ বহন করেছে তারই সূত্র ধরে তিনি প্রাচীনের অনুসন্ধান করেছেন। ঐতিহাসিক পরিচয়জ্ঞাপনের সূত্রে তাঁর কল্পনাপ্রবণ মনের লঘুপক্ষ বিচরণ হয়তো কোথাও কোথাও ঘটেছে এবং তাতে বর্ণনার স্বাদুতা অনিবার্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু ভাবালুতার দ্বারা ইতিহাসের তথ্য কোথাও বিকৃত হয়নি অথবা চাপা পড়েনি। ইতিহাস-রচয়িতাদের সম্পর্কে সত্যাসত্য নির্ধারণের যে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়গুলি নির্দেশ করেছেন তাতে তাঁর দেশ-বিদেশের ইতিহাস-বর্ণনার সময় ঐ উপায়গুলি প্রয়োগের প্রচেষ্টা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া যায়।

॥ কনস্টান্টিনোপ্‌ল ; এথেন্স, গ্রীস ও প্যারির লুভার মিউজিয়মে গ্রীকশিল্পকলা ॥

॥ ১ ॥

'পরিব্রাজক' গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশের এই আলোচনাগুলি গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ থেকে সংযোজিত হয়েছে। তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন অংশে বলা হয়েছে যে, বিবেকানন্দের কাগজ-পত্র অনুসন্ধানের ফলে তাঁর ডায়েরির মধ্যে সংবাদধর্মী যে ভ্রমণ সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায় সেইগুলিই এই অংশে পরিবেশিত হয়েছে। এই পরিশিষ্টাংশের আলোচনার পূর্বাহ্ণেই বলা প্রয়োজন যে, এই অংশের সাহিত্যিক মূল্য নেই বললেই চলে ; ইতিহাস-পর্যালোচনা বা ভৌগোলিক বৃত্তান্ত-বর্ণনা অংশ খুবই সামান্য। গ্রন্থন-নৈপুণ্য প্রকাশেরও কোন চেষ্টা নেই, তবে ছোট ছোট সংবাদের ভিতর দিয়ে সুদূর অতীত ও অজ্ঞাত প্রাচীনের কিছু আভাস দেবার চেষ্টা আছে।

কনস্টান্টিনোপলের সঙ্গে তাঁর যে প্রথম দৃষ্টিবিনিময় ঘটেছে তাতে দেখেছেন, প্রাচীন শহরের জীর্ণতা বহন করছে এই দেশ। অপরিচ্ছন্ন সংকীর্ণ গলিপথ, কাঠের বাড়ি—এর মধ্যেই রকমফের বৈচিত্র্যের জন্য একটি বিশেষ সৌন্দর্য অনুভব করেছেন। তারপর ক্রমশঃ দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দেখেছেন শহর, বাজার, সমুদ্রের খাড়ি, বিদেশীদের কোয়ার্টার্স, হোটেল প্রভৃতি। প্রথম দিনেই সন্ধ্যার দিকে বুড্‌স্ পাশার দর্শন লাভের জন্য গমন করেন। পরের দিন বোটে চড়ে বাস্ফোর ভ্রমণে যাত্রা করেন ; কিন্তু প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়ার জন্য নিকটবর্তী প্রথম স্টেশনে নেমে সঙ্গীদের নিয়ে অপর তীরে বোট ভাড়া করে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত কঠোর তপস্বীশাখাভুক্ত সন্ন্যাসী পেয়র হিয়াসান্থের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য বাস্ফোরের অপর তীরে অবতরণ করেন এবং সেখান থেকে গাড়ি

ভাড়া করে উদ্দিষ্ট স্থানের গমনপথে সুফি ফকিরের ঝাড়-ফুঁক করে রোগ নিরাময়ের বিভিন্ন কলাকৌশল লক্ষ্য করেন। তারপর হিয়াসাম্বের সঙ্গে আমেরিকান কলেজ সম্বন্ধীয় কথাবার্তা শেষ করে আরবের দোকান, বিদ্যার্থী টর্ক দর্শন করে পুনরায় গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। স্তাম্বুলের (কন্‌ষ্টান্টিনোপলের রাজধানী) মিউজিয়মের অবস্থান সম্পর্কে বলেছেন, গ্রীকবাদসাদের প্রাচীন অন্দরমহলে এই আধুনিক মিউজিয়ম বর্তমানে অবস্থিত। শবদেহ রক্ষা করবার প্রস্তর-নির্মিত আধার ও তোপখানার উপর থেকে শহরের মনোরম দৃশ্য দর্শন, বিদেশে দেশীয় ছোলাভাজার আস্বাদে অতিরিক্ত তৃপ্তি লাভ, তুর্কী আহার্য, স্কুটারীর কবরখানা ও প্রাচীন পাঁচিলের মধ্যে ভয়ঙ্কর জেলখানা দেখা প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গ ভাষ্যকারের মত বলে গেছেন। কোথাও বিশ্লেষণ অথবা ব্যাখ্যা নেই। ব্যক্তি ও জাতি-প্রসঙ্গে কোথাও বিস্তৃত বর্ণনা নেই, যেন চলতে চলতে দেখা অথবা দেখতে দেখতে চলা—পথের দু'ধারে দেখা দৃশ্য এবং কোন ব্যক্তির সঙ্গে হঠাৎ সাক্ষাৎ লাভের বৃত্তান্ত সংক্ষিপ্ত-সমাচারের মত বর্ণনা করা হয়েছে। ঐ দেশের পররাষ্ট্র-সচিবের অধীনস্থ কোন কর্মচারীর সঙ্গে ভোজন, জনৈক গ্রীক পাশা ও একজন আলবানি ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা; এখানকার স্ত্রীলোকদের পর্দাহীনতা এবং আরমিনিয়ানদের অসহায়তার কথা বলা হয়েছে। আরমিনিয়ানদের সম্পর্কে তুলনা-মূলক ভাবে একটু দীর্ঘসূত্রী আলোচনার অবকাশ সৃষ্টি করে বলেছেন যে, মুসলমান-প্রধান অঞ্চলে তারা বাস করে কিন্তু তাদের নিজস্ব দেশ বলে কিছুই নেই। তথাপি দেশরক্ষার প্রয়োজনে এদের ডাক পড়ে এবং সুলতান তাদের যুদ্ধে যোগদানের সর্তে ট্যাক্স মকুব করার উদারতা দেখান। এই প্রসঙ্গে এদের ধর্মসম্পর্কে দুর্বলতার কথা বলতে গিয়ে স্বামীজী বেশ কৌতুকোজ্জ্বল মন্তব্য করেছেন। যুদ্ধে মৃত্যু হলে মুসলমানদের সঙ্গে এক কবরে সমাধিস্থ হবার আশংকায় এরা যুদ্ধে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। সুলতান মৃত্যুকালে মোল্লা

ও ক্রিশ্চান পাদ্রী উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত পুরোহিতকে উপস্থিত রাখার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও এরা যুদ্ধে যোগদান না করে ট্যাক্স দেওয়াকেই নীতিগত ভাবে মেনে নেয়। বিবেকানন্দের এই প্রসঙ্গে সকৌতুক মন্তব্যটি উদ্ধার্য ঃ

> "...লড়ায়ে যখন ক্রীশ্চান ও মুসলমান ফৌজের শবদেহ-সকল একত্রে এক গাদায় কবরে পুঁততে বাধ্য হবে, তখন না হয় দুই ধর্ম্মের পাদ্রীই (funeral service) শ্রাদ্ধমন্ত্র পড়্‌ল ; না হয় এক ধর্ম্মের লোকের আত্মা, বাড়ার ভাগ অন্য ধর্ম্মের শ্রাদ্ধ মন্ত্রগুলো শুনে নিলে।"

পরিশেষে বর্তমান স্তাম্বুলের বাদসার ক্লেশসহিষ্ণু, বুদ্ধিদীপ্ত, কঠোর কর্তব্য-পরায়ণ চরিত্রের বর্ণনা করেছেন এবং পূর্বতন স্থলতান মুরাদের অকর্মণ্যতার কথা বলেছেন। অতি দুরবস্থা থেকে রাজ্য পুনর্গঠনে বর্তমান সুলতানের কৃতিত্বের প্রসঙ্গও স্বামীজী স্বীকার করেছেন।

॥ ২ ॥

কনস্টান্টিনোপলের পরে স্বামীজী গ্রীসের উদ্দেশে যাত্রা করেন। স্থিরসমুদ্রের উপর দিয়ে জাহাজ এক দিন ও একরাত্রি অর্থাৎ দেড় দিন চলার পর Golden Horn (সুবর্ণ শৃঙ্গ) ও মারমোরা দ্বীপে এসে পৌঁছায়। মারমোরা দ্বীপপুঞ্জে প্রথম দর্শনীয় বস্তু যেটি স্বামীজীর চোখে পড়ে সেটি গ্রীক ধর্মমঠ। এই মারমোরা দ্বীপ-পুঞ্জের অবস্থান এসিয়া ও ইউরোপের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে হওয়ায় উভয় দেশের অধিবাসী প্রাচীনকালে এখানে ধর্মশিক্ষা করতে আসত এবং স্বামীজী এই অঞ্চলের ধর্মমঠটি প্রাচীনকালে ধর্মশিক্ষার উপযুক্ত ও সুবিধাজনক স্থান বলে বর্ণনা করেছেন। পরের দিন সকালে মেডিটরেনি দ্বীপপুঞ্জ (ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ) ভ্রমণ করতে গিয়ে

স্বামীজীর সঙ্গে মাদ্রাজে পাচিয়াপ্পার কলেজে পরিচিত প্রোফেসর লেপরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটে। এখানে একটি দ্বীপে প্রথমে তাঁর চোখে পড়ে একটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এবং সমুদ্রতীরে এই ভগ্ন মন্দিরটির অবস্থিতি দেখে নেপচুনের মন্দির বলেই তিনি অনুমান করেন। সন্ধ্যার পর গ্রীসের রাজধানী এথেন্সে স্বামীজী জাহাজযোগে উপস্থিত হন, কিন্তু আইনগত বিধি-নিষেধ অনুযায়ী পরের দিন সকাল বেলা তিনি জাহাজ থেকে তীরে নামবার হুকুম পান। তীরবর্তী শহর অর্থাৎ বন্দর-সংলগ্ন শহরটির নাম পাইরিউসটি। বন্দরটির সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিল, যদিও কয়েক জন ঘাগরাপরা গ্রীক ছাড়া ইউরোপীয় বন্দর থেকে একে পৃথক্ করে চেনবার কোন উপায় নেই বলে তিনি জানিয়েছেন। তার পর দেশের অভ্যন্তরে তাঁর প্রথম দর্শনীয় বস্তু প্রাচীন প্রাচীব, যা এথেন্সকে বন্দরের সঙ্গে সংযুক্ত করত। শহরের বাড়ি-ঘর ও রাস্তার পরিচ্ছন্নতা তাকে মুগ্ধ করেছিল। বাজবাড়িটি সম্পর্কে বলেছেন যে, এটি বিশাল-ব্যাপক নয়, পরন্তু ছোট। সেই দিনই পাহাড়ের উপর অবস্থিত আক্রোপলিস, বিজয়ার মন্দির ও পারথেনন প্রভৃতি দর্শন করেছেন, মন্দিরটি সম্পর্কে বলেছেন যে,এটি সাদা পাথরের তৈরি এবং সেই সঙ্গে তাঁর চোখে পড়েছে কয়েকটি প্রাচীন স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ। পরের দিন মাদ্‌মোয়াজেল মেলকার্বির সঙ্গে এই সব পুনরায় দর্শন করতে গিয়ে এগুলি সম্পর্কে বহু ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছে। দ্বিতীয় দিন ওলিম্পিয়ান জপিটারের মন্দির, থিয়েটার ডাইওনিসিয়াস ও সমুদ্রতট পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেছেন এব তৃতীয় দিন গ্রীসের প্রধান ধর্মস্থান এলুসির উদ্দেশে যাত্রা করেছেন। এই এলুসি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয়দান-সূত্রে বলেছেন যে, এখানে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এলুসি-রহস্যের অভিনয় হত এবং এক ধনী গ্রীক। সেই প্রাচীন ভগ্নপ্রায় থিয়েটারটি নিজ ব্যয়ে নতুন করে তৈরি করে-দিয়েছেন। স্পার্টার কাছে প্রাচীন অলেম্পিক ক্রীড়ার পুনঃপ্রবর্তন

হয়েছে এবং এই প্রসঙ্গে একটি কৌতুককর সংবাদ তিনি দিয়েছেন যে, আমেরিকানরা এই ক্রীড়ার অনেক বিষয়ে জয়ী হয় কিন্তু গ্রীকরা স্পার্টা থেকে ঐ প্রাচীন থিয়েটার পর্যন্ত দূরত্বের দৌড়-প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়। বিবেকানন্দ যে সময়ে গ্রীস পরিভ্রমণ করেন, সেই বৎসরও তুর্কীদের সঙ্গে দৌড়ে গ্রীকরা এই বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে। চতুর্থ দিনে রুশ দেশীয় স্টীমারে ইজিপ্ট যাত্রার উদ্দেশ্যে বন্দরে এসে উপস্থিত হন, কিন্তু সময়ের বিলম্ব থাকা অথবা জিনিস-পত্র তোলার কারণেই হোক জাহাজ ছাড়তে বিলম্ব হবে বলে জানলেন। এই সুযোগে প্রাচীন শিল্পাচার্য জেলাদাস ও তাঁর শিষ্যত্রয়—ফিডিয়াস, সিরন, পলিক্লেটের ভাস্কর্য দেখে আসেন। এই প্রসঙ্গে যাত্রী, গরু ও ভেড়ায় পূর্ণ রুশজাহাজ সম্পর্কে তার মন্তব্যে বেদনার সুরটি বেশ স্পষ্ট।

॥ ৬ ॥

বিবেকানন্দের জীবনটা যে সাধারণের কাছে কত গভীর বিস্ময় সৃষ্টিকারী তা' আর একবার প্রমাণিত হবে গ্রীকশিল্প সম্পর্কে তাঁর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। অধ্যাত্মরসে আপ্লুত, মানব-চিন্তায় উৎসর্গীকৃত জীবন যে কলাবিদ্যার প্রতিও কৌতূহলপরায়ণ হতে পারে তা' বিবেকানন্দের শিল্পভাবনা সম্পর্কে অবহিত না হলে জানা যায় না। ফ্রান্সের প্যারি নগরস্থ লুভার মিউজিয়মে গ্রীক শিল্পকলা দেখে তিনি গ্রীকশিল্পের ক্রমবিবর্তনের ব্যাখ্যায় সুনিপুণ শিল্প-সমালোচক হয়ে উঠেছেন। গ্রীকশিল্পের সর্বপ্রাচীন অবস্থাকে বলেছেন 'মিসেনি' শিল্পের কাল। এই মিসেনি শিল্পের কাল নির্দেশ করেছেন, অজ্ঞাতপূর্ব কাল থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ৪৭৬ বৎসর পর্যন্ত। এসিয়ার শিল্পের অনুকরণেই এই শিল্পের উদ্ভব বলে তিনি জানিয়েছেন।

খ্রীষ্টপূর্ব ৭৭৬ থেকে ১৪৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত 'হেলিনিক' বা যথার্থ গ্রাকশিল্পের কাল বলে তিনি নির্দেশ করেছেন। গ্রীসের আচেনি রাজ্যের সঙ্গে এসিয়ার যোগসূত্রের সম্পর্কে 'মিসেনি' শিল্পের উদ্ভব হয়েছিল, কিন্তু এই আচেনি রাজ্য দোরিয়ান জাতির দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় গ্রীকরা এসিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে আশ্রয় নেয় এবং উপনিবেশ গড়ে তোলে। এই উপনিবেশ বিস্তারের ফলে বাবিল ও ইজিপ্তের সঙ্গে তাদের ঘোরতর সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে গ্রীকরা এসিয়ার শিল্পরীতি পরিত্যাগ করে মৌলিক গ্রীকশিল্পের প্রবর্তনে সচেষ্ট হয়। গ্রীকশিল্পের সম্পর্কে বলেছেন যে, প্রাকৃতিক স্বাভাবিক জীবনের যথাযথ জীবন্ত ঘটনার শিল্প-রূপ দেওয়াই এদের বৈশিষ্ট্য। এই গ্রীকশিল্পকে স্বামীজী কালানুক্রমিকভাবে তিনটি যুগের দ্বারা চিহ্নিত করেছেন।

খ্রীষ্টপূর্ব ৭৭৬ থেকে ৪৭৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত 'আর্কেইক' গ্রীকশিল্পের কাল। এই যুগের শিল্পকলা সম্পর্কে বলেছেন যে, মূর্তিগুলিতে জীবনের সজীবতা ফুটে ওঠেনি, বরং শক্ত বা আড়ষ্ট। মূর্তিগুলির ঠোঁট অল্প খোলা এবং সদা হাস্যময় ও দু'পায়ে সোজা দাঁড়িয়ে, কোন অঙ্গভঙ্গি নেই—চুল দাড়ি সমস্ত সরলরেখাকারে খোদিত এবং দেহের বস্ত্রাবরণ সুবিন্যস্ত নয়, দেহ থেকে পতনশীল।

'আর্কেইক' গ্রীকশিল্পের পরে ৪৭৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ কাল 'ক্লাসিক' গ্রীকশিল্পের কাল হিসাবে চিহ্নিত। এই শিল্পের উন্নতি ও বিস্তারকাল এথেন্সের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার সময় থেকে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই অন্তর্বর্তী সময়। এই ক্লাসিক গ্রীকশিল্পের উন্নতি-স্থান ঐ দেশের পিলপনেশ ও আটিকা রাজ্যে। জনৈক কলাবিদ্যানিপুণ ফরাসী-পণ্ডিতের অভিমতও এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন। সেই অভিমতের নির্গলিতার্থ এই যে, ক্লাসিক গ্রীকশিল্পের চরম উন্নতিকালে নিয়মবদ্ধ রীতির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাব অর্জন করে এবং কোন দেশের

কলাবিধির অনুসরণে এই শিল্পকে নিয়ন্ত্রিত করেনি। বিধি-নিয়মকে অস্বীকার করে এই যুগের মূর্তিগুলি ভাস্কর্যের চূড়ান্ত নিদর্শন স্থাপন করে এবং আপন দেহে সজীবতার লক্ষণ বহন করে। এই ক্লাসিক গ্রীকশিল্প দু'টি সম্প্রদায়ের মধ্যে দিয়ে দু'টি বিশিষ্ট ধারায় উৎকর্ষতা অর্জন করে—একটি 'আটিক', দ্বিতীয়টি 'পিলোপনেসিয়েন'। এই আটিক সম্প্রদায়ের আবার একটি ধারায় মহাশিল্পী ফিডিয়াসের প্রতিভাবলে শিল্পসৃষ্টির মধ্যে অপূর্ব সৌন্দর্যমহিমা ও দেবভাব পরিস্ফুট হয়ে মানবমনে চিরকালীন আবেদন সৃষ্টি করে এবং এই অভিমত বিশিষ্ট ফরাসী-পণ্ডিত-সমর্থিত। আটিক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ধারার শিক্ষক স্কোপাস এবং প্র্যাক্সিটেল। এই সম্প্রদায়ের শিল্পসৃষ্টির মূল সর্ত হল শিল্পকে ধর্ম থেকে বিচ্যুত করে মানুষের জীবন বিবরণের সঙ্গে যুক্ত করা।

ক্লাসিক গ্রীকশিল্পের দ্বিতীয় সম্প্রদায় পিলোপনেসিয়েন নামে পরিচিত এবং এই ধারার প্রবর্তক পলিক্লেট এবং লিসিপ্স নামে দু'জন শিল্প-শিক্ষক। এঁদের একজন খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে এবং অপর জন খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। এঁদের শিল্প সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য হল মানব শরীরের গঠনগত পরিমাপ শিল্পে যথাসাধ্য বজায় রাখা।

৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৬ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ আলেক-জাণ্ডারের মৃত্যুর পর থেকে রোমানদের দ্বারা আটিকা বিজয়কাল পর্যন্ত এই অন্তর্বর্তী সময় গ্রীকশিল্পের অবনতি কাল বলে স্বামীজী নির্দেশ করেছেন। এই সময়ে গ্রীকশিল্পে জাঁকজমক ও মূর্তিগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড করে নির্মাণ করার দিকেই প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীকালে গ্রীস রোমান-অধিকৃত হওয়ায় গ্রীকশিল্প প্রাচীনের অনুকরণ ও মানুষের মুখাকৃতির হুবহু নকল ছাড়া কোন নূতনত্বের সৃষ্টি করতে পারেনি।

শিল্প সম্বন্ধে বিবেকানন্দের কি গভীর অনুরাগ ও পর্যবেক্ষণ

শক্তি ছিল তা' গ্রীকশিল্পের পর্যালোচনার মধ্যেই প্রমাণিত হয়। তাঁর ভূয়োদর্শিতার পরিচয় পরিব্রাজকের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। গ্রন্থারম্ভেই লক্ষ্য করা যায় যে, গঙ্গার গতিপথ বর্ণনা ও সাগরসঙ্গমে জেম্‌স ও মেরী নামে দুটি বালির চড়ার অবস্থান প্রভৃতি নির্দেশ করে ভারতবর্ষের একটি বিশিষ্ট জলপথের পরিচয়কে প্রাজ্ঞ ভৌগোলিকের মত তুলে ধরেছেন। জাহাজের ক্রমোন্নতি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে কাঠ কেটে চাকা তৈরি থেকে আধুনিক বাষ্পীয়পোত ও রণপোতের পর্যন্ত নিখুঁত পরিচয় বিবৃত করেছেন। জাহাজের কর্মচারী এবং প্রত্যেকের স্বতন্ত্র পরিচয় ও দায়িত্ব বহনের খুঁটিনাটি তথ্যও পাঠকের কাছে সরবরাহ করেছেন। দেশ-বিদেশ সম্পর্কে বলতে গিয়ে একটি জাতির অভ্যুত্থান থেকে বিকাশ পর্যন্ত সুদীর্ঘ বৃত্তান্ত সংহত ভাবে তথ্যনিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরেছেন এবং সেই সঙ্গে প্রত্যেক দেশের ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিচয়কেও সমন্বিত করেছেন। সর্বশেষে বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন অসাধারণ শিল্পবোধের পরিচয় দিয়ে। গ্রীকশিল্পের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে বিভিন্ন বিভাগ, উপবিভাগ থেকে শুরু করে সামগ্রিকভাবে গ্রীকশিল্পকলার ইতিহাসকে শিল্প-অনভিজ্ঞ পাঠকের কাছেও সহজবোধ্য করে বিবৃত করেছেন। বিবেকানন্দ পরিব্রাজকের এই সংক্ষিপ্ত কলেবরে এত অসংখ্য বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন যে, পাঠকের বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের সুযোগ ঘটেছে।

৭

॥ বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতনা ॥

দেশ ও জাতির সার্বিক উৎকর্ষতা বিধানের জন্য ইতিহাস-জ্ঞান একটি অপরিহার্য উপাদান। ইতিহাসের সূত্রেই সংকীর্ণতার উন্মোচন ঘটে ; ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বের এবং বৃহৎ মানব জাতির পরিচয় হয়। অপরকে জানার সুযোগ যেমন সৃষ্টি করে তেমনি অনিবার্য-ভাবেই আত্মানুসন্ধান ঘটে। ইতিহাসের প্রাচীন বিস্তৃত প্রান্তরেই রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি অবস্থার সঙ্গে আধুনিক জনজীবনের পরিচয় স্থাপিত হয় এবং আমাদের অজ্ঞতা ও সংকীর্ণতার অবসান হয়। কোন জাতি অথবা দেশকে উন্নততর এবং মহত্তর জীবনোপলব্ধির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয় ইতিহাস-জ্ঞান। ব্রিটিশ কবলিত ভারতবর্ষে যখন স্বাধীনতার আন্দোলন ঠিক দানা বেঁধে উঠতে পারেনি, সেই সময়ে দেশ ও জাতির প্রাচীন ইতিহাসের অনুসন্ধান যেমন শুরু হয় তেমনি বহির্ভারতের ইতিহাসকেও জাতির সামনে তুলে ধরার চেষ্টা চলতে থাকে। উনিশ শতকের বাঙলা দেশের মনীষীমাত্রেই ইতিহাসের প্রতি, অনুরাগী ছিলেন। তাঁরা মনে করতেন জাতির প্রাণে স্বদেশ সম্পর্কে আত্মশ্লাঘা বোধ জাগিয়ে তুলতে না পারলে পরাধীনতার কলঙ্ক উপলব্ধি করার মত চেতনা-বোধের স্ফুরণ ঘটবে না। জাতীয় জাগরণের জিয়ন-কাঠি এই ইতিহাস। বিবেকানন্দের 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে বহির্ভারতের ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে ভারতের সঙ্গে যোগসূত্রের দিকটি স্পষ্ট করে তোলার চেষ্টা আছে এবং এই সূত্রে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, দেশ ও জাতির মুক্তি কামনায় উৎসর্গীকৃত-প্রাণ স্বামীজী দেশবাসীর অন্তরে

স্বদেশের প্রতি গৌরববোধ সঞ্চারের জন্যও সচেষ্ট ছিলেন ; তাছাড়া সাধারণ পাঠকের সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের পরিচয় সাধনের আন্তরিক প্রয়াসও ছিল।

বিবেকানন্দের সহোদর ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'Swami Vivekananda, patriot and prophet' গ্রন্থে লিখেছেন যে, পিতা বিশ্বনাথ দত্তের গ্রন্থাগারে কয়েক খণ্ড সম্পূর্ণ রোমের ইতিহাস, জুলিয়াস সীজারের জীবনী, সুইডেনের রাজা দ্বাদশ চার্লসের জীবনী প্রভৃতি গ্রন্থ ছিল। স্বামীজী কলেজে দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে ইতিহাসকেও পাঠ্যবিষয় রূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং এই সূত্রে গ্রীনের লেখা ইংরেজ-জাতির ইতিহাস এবং য়ুরোপের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস পড়েন।[১] সুতরাং এ কথা নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত যে, বিবেকানন্দের ইতিহাস সম্পর্কে প্রীতিবোধ একান্ত ছাত্রাবস্থা থেকেই জন্মেছিল এবং তাঁর সেই সুগভীর ইতিহাস জ্ঞানের পরিচয় 'পরিব্রাজক' গ্রন্থের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। বাঙলা দেশের ইতিহাসের দীনতা সম্পর্কে তাঁর গভীর অন্তর্বেদনা সিংহল-ভ্রমণ বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রকাশ হয়ে পড়েছে ঃ

> "সিলোনিরা আপনাদের ইতিহাস উত্তমরূপে লিখে রেখেচে। আমাদের মত নয়—খালি আষাঢ়ে গল্প।"

এই বেদনাবোধ তাঁর অন্তরের এত গভীরে প্রথিত হয়েছিল যে, ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী ভূ-খণ্ডে সুউচ্চ সভ্যতা ও সংস্কৃতির অভ্যুত্থান ও অবসান-বৃত্তান্ত সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে পুনরায় প্রকাশ হয়ে পড়েছে এবং সেই সঙ্গে বাঙালীর আর্থিক দৈন্য যে ইতিহাস রচনায় কতদূর অন্তরায় সৃষ্টি করেছে তাও তিনি না বলে পারেননি ঃ

---

১. বিশ্ববিবেক—ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর 'স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক চেতনা ও রাষ্ট্রীয় আদর্শ' প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

"আমাদের বাঙলা ভাষায় কিছুই নাই। হবে কি করে?—এক বেচারা ১০ বৎসর হাড়গোড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করে যদি এই রকম একখানা বই তর্জমা করে তো সে নিজেই বা খায় কি, আর বই বা ছাপায় কি দিয়ে।"

ইতিহাস হিসাবে প্রচারিত বাঙলার ইতিহাস যে যথার্থ ইতিহাস নয় এই খেদোক্তি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিবেকানন্দের বহুপূর্বে প্রকাশ করেছেন ঃ

"এ ইতিহাস নহে—এ সত্যও নহে—এ পিতামহীর উপন্যাস মাত্র।"[১]

এইরূপ আক্ষেপ বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য প্রবন্ধেও পাওয়া যায় ঃ

"বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয় তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিধর্মী অসার পরপীড়কদিগের জীবনচরিত মাত্র।"[২]

দেশ-বিদেশের ইতিহাস সম্পর্কে স্বামীজীর কৌতূহলটাই শেষ কথা নয়, ইতিহাসের তথ্যস্তূপ থেকে সত্য উদ্ধার সম্পর্কে যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণমুখী চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন তাতে গবেষণা-নির্ভর ইতিহাস-পাঠক হিসাবে তাঁকে অনিবার্যরূপে চিহ্নিত করতে হয়। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি একটি বিস্তৃত অধ্যায় জুড়ে ইতিহাস-কথা থেকে কিভাবে প্রামাণ্য সত্যকে সন্ধান করতে হয় তার বৈজ্ঞানিক কৌশলটি নিষ্ঠাবান্ ইতিহাস পাঠকের কাছে ধারাবাহিক ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এই প্রসঙ্গের মুখবন্ধেই তিনি ইতিহাস পাঠকের কাছে একটি প্রাসঙ্গিক ও মৌলিক প্রশ্নের অবতারণা করেছেন ঃ

"কেউ দয়া কোরে একটা পুস্তকে যা হয় লিখেচেন বল্লেই

---

১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বিবিধ প্রবন্ধ ঃ বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ।

২. ঐ — ঐ ঃ বাঙ্গালার ইতিহাস সম্পর্কে কয়েকটি কথা।

কি সেটা সত্য হল? লোকে, বিশেষ সে কালের, অনেক কথাই কল্পনা থেকে লিখতো, আবার প্রকৃতি, এমন কি, আমাদের পৃথিবী সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান অল্প ছিল; এই সকল কারণ গ্রন্থোক্ত বিষয়ের সত্যাসত্যের নির্দ্ধারণে বিষম সন্দেহ জন্মাতে লাগল…"

সুতরাং প্রাচীন ইতিহাস পড়তে গেলে খুব সতর্ক হওয়া প্রয়োজন বলেই তিনি নির্দেশ করেছেন। এই সতর্কতার সূত্রগুলি ক্রমান্বয়ে যুক্তি, বিশ্লেষণ ও উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করেছেন। ইতিহাস বিবৃত ঘটনার সত্যাসত্য যাচাইয়ের প্রথম উপায় সম্পর্কে বলেছেন— একজন গ্রীক ঐতিহাসিক যদি বলেন ভারতবর্ষে কোন এক সময়ে চন্দ্রগুপ্ত নামে এক রাজা ছিলেন; তখন প্রথমে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন যে, এই রাজার পরিচয়টি ভারতবর্ষের ঐ সময়কার কোন গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে কিনা। এ সম্পর্কে নিশ্চিত হলে সন্ধান করতে হবে ঐ রাজার সময়ের কোন মুদ্রা বা বাড়ির সঙ্গে তাঁর নাম সংযুক্ত আছে কিনা। এই সর্তগুলি পূরণ হলে ইতিহাস বিবৃত ঘটনাকে প্রামাণ্য বলে তখনই মাত্র গ্রহণ করা উচিত হবে বলে তিনি মনে করেন।

দ্বিতীয় উপায় সম্পর্কে বলেছেন; কোন একটি ঘটনা সিকন্দর বাদ্সার সময়ে উল্লেখিত হয়েছে, অথচ তার মধ্যে দু'একজন রোমক বাদসার উল্লেখ আছে এবং এই উল্লেখকে প্রক্ষিপ্ত বলেও প্রমাণ করা অসম্ভব। তখন সেই ঘটনাটি সিকন্দর বাদ্সার সময়ের নয় বলেই গ্রহণ করা উচিত।

তৃতীয় বিচারপদ্ধতি নির্দেশ করেছেন; একটি ধারাবাহিক একই রীতিতে বিবৃত কোন কাহিনীর মধ্যে বিপরীত রীতিতে অপ্রাসঙ্গিক কোন বর্ণনার বিস্তার ঘটলে সঙ্গত কারণেই সেই অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করতে হবে। এই ভাবে নানা প্রকার সন্দেহ, সংশয়, প্রমাণ প্রয়োগ করে আধুনিক গ্রন্থতত্ত্ব নির্ণয়ের বিদ্যা আবিষ্কৃত

হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। আধুনিক বিদ্যাবলে ও বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্রুত পদসঞ্চারে অলৌকিক বৃত্তান্ত সম্বন্ধ ঘটনা অবিশ্বাস্য বলে ঘোষিত হতে থাকে।

পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম উপায় প্রসঙ্গে বলেছেন ; ইউরোপে সংস্কৃত ভাষার প্রবেশ এবং ভারতবর্ষে, ইউফ্রেটিস নদীতটস্থ দেশ ও মিসর দেশের প্রাচীন শিলালেখের পুনঃপঠন, ভূগর্ভ বা পর্বতপার্শ্বস্থ প্রাচীন লুক্কায়িত মন্দির প্রভৃতির আবিষ্ক্রিয়া ঐ সকল দেশের ইতিহাস-জ্ঞান উদ্ঘাটনের সহায়ক। ধর্মীয় গোঁড়ামির জন্য বাইবেল বা নিউ টেস্টামেন্টের মত য়াহুদি ও ক্রিশ্চানদের ধর্মগ্রন্থ বিশ্লেষণ বহুকাল পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল এবং বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রাণহানিরও আশংকা ছিল, কিন্তু বর্তমানে সেই সকল গ্রন্থের বিচার-বিশ্লেষণ হয়েছে। বিবেকানন্দ এই প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যে সাধুবাদ জানিয়ে বলেছেন, বিদেশীরা হিন্দু প্রভৃতির ধর্মগ্রন্থের যেমন বেপরোয়া বিশ্লেষণ করেন তেমনি য়াহুদি ও ক্রিশ্চান ধর্মপুস্তকগুলি বিচারে যেন অনুরূপ সৎসাহস দেখান। এই অভিমতের দ্বারা বিশেষ পক্ষপাতিত্বের প্রতি যে ইঙ্গিত করেছেন তারও সঙ্গতকারণ নির্দেশ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন যে, মস্‌পেরো নামে এক পণ্ডিতের মিসর ও বাবিলের প্রত্নতত্ত্বের উপর লিখিত 'ইস্তোয়ার আঁসিএন ওরিআঁতাল' নামে ফরাসী গ্রন্থের ইংরেজী তর্জমা তিনি পড়েন এবং ব্রিটিশ মিউজিয়ম দেখতে গিয়ে এই গ্রন্থের প্রসঙ্গ ওঠায় তিনি মিউজিয়মের অধ্যক্ষের কাছে শোনেন যে, অনুবাদকের ক্রিশ্চান ধর্মের প্রতি গোঁড়ামির জন্য মূল গ্রন্থের বিবৃত তথ্যকে তিনি অনেক বিকৃত করেছেন। পরে মূল ফরাসী গ্রন্থ পাঠ করে স্বামীজী অধ্যক্ষের অভিমতের সারবত্তা উপলব্ধি করেন এবং ধর্মীয় গোঁড়ামির গলদ স্পষ্ট বুঝতে পেরে ইতিহাসের বিকৃতির কারণ নির্দেশ করেন।

আধুনিক জাতিবিদ্যা ইতিহাস নির্ণয়ের আর একটি প্রয়োজনীয়

কুঞ্চিকা বলে তিনি জানিয়েছেন। মানুষের রং, চুল, চেহারা, মাথার গঠন, ভাষা প্রভৃতি দেখে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষকে কয়েকটি শ্রেণী বা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই জাতিবিদ্যা-সমর্থিত বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর পরিচয়সূত্রে তিনি বলেছেন, কাফ্রীরা নিগ্রো-শ্রেণীর; সাঁওতাল, আণ্ডামানি, ভিল, নেগ্রিটো-শ্রেণীর; লেপচা, ভুটিয়া, চীনি প্রভৃতি মোগল এবং নেপালি, বর্মি, সায়েমি, মালাই, জাপানি, মোগলইড্ শ্রেণীভুক্ত। প্রাচীন মিসর, প্রাচীন বাবিলোনিয়া ও বর্তমান ভারতের দক্ষিণদেশবাসী এবং ইউরোপের কয়েকটি অঞ্চলে যে সমশ্রেণীর মানুষ দেখা যায় তারা দ্রাবিড় হিসাবে পরিচিত; বর্তমান য়াহুদি, প্রাচীন বাবিল, আসিরি, ফিনিক প্রভৃতি সম ভাষা-ভাষী মানুষরা সেমিটিক এবং সংস্কৃতের-সদৃশ ভাষাভাষী সোজা নাক মুখ চোখ, রং সাদা, চুল কালো বা কটা, চোখ কাল বা নীল—এই সব বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত জাতি আরিয়ান্ (আর্য) নামে পরিচিত। বর্তমান সকল জাতিই বিভিন্ন গোষ্ঠীর রক্ত-সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু মূল নরগোষ্ঠীর ও মূল-ভাষাভাষীর সংখ্যাগরিষ্ঠরাই এক একটি দেশে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছে। দেহের রঙ্ কালো বা সাদা জলবায়ুর প্রভাবে সৃষ্টি হয়নি, এবং জাতি-মিশ্রণে যে রঙের তারতম্য ঘটেছে—এই আধুনিক মতটি তিনি পাঠককে ইতিহাসের সত্যাসত্য নির্ণয় ও ইতিহাস রচনার পদ্ধতি নির্দেশের সমাপ্তিতে জানিয়েছেন।

সুগভীর প্রজ্ঞা ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিনিষ্ঠতা নিয়েই স্বামীজী দেশ-বিদেশের ইতিহাসের প্রাসঙ্গিক সকল তথ্য তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীতে পরিবেশন করেছেন। মাদ্রাজ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলেছেন, দক্ষিণ ভারত শৈবপ্রধান দেশ; কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজের প্রভাবে বৈষ্ণবধর্মের প্রসার ও বাঙলা দেশে তার প্রভাব এবং শঙ্করাচার্য, মধ্বাচার্য প্রমুখ দক্ষিণ ভারতীয় ধর্মপ্রবর্তকের প্রভাবে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ধর্মীয় নেতাদের প্রতিক্রিয়ার প্রসঙ্গও

উল্লেখ করেছেন। উত্তর ভারতের মুসলমান সম্রাটদের অপ্রতিহত গতিরোধে মাদ্রাজের প্রাচীন হিন্দু রাজাদের সম্পর্কে তিনি সপ্রশংস অভিমত ব্যক্ত করেছেন ঃ

"এই দক্ষিণ-দেশেই-যখন উত্তর ভারতবাসী, 'আল্লা হু আকবর, দীন্ দীন্' শব্দের সামনে ভয়ে ধনরত্ন ঠাকুর দেবতা স্ত্রী পুত্র ফেলে ঝোড়ে জঙ্গলে লুকুচ্ছিল,—রাজচক্রবর্ত্তী বিদ্যানগরাধিপের অচল সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল।"

ইউফ্রেটিস নদীর তীরে সভ্যতাগঠনে মাদ্রাজের তামিল সুমের শাখার দান ; জ্যোতিষ, ধর্মকথা, নীতি ও আচারের কাছে বাবিল সভ্যতার ঋণ; পুরাণকথায় বাইবেলের পুষ্টিসাধনে ; মিসরি সভ্যতার বনিয়াদগঠনে, আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির পুষ্টিসাধনে দক্ষিণ ভারতের দান সম্পর্কে অনেক তথ্যসমৃদ্ধ ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত পরিবেশন করেছেন। দক্ষিণীদের বাহ্যিক আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, আহার্য প্রভৃতি নানা সংবাদ তিনি দিয়েছেন।

সিংহল প্রসঙ্গে প্রথমেই রামায়ণ-বর্ণিত রাম ও রাবণের কথা বলেছেন এবং সিংহলবাসীরা নিজের দেশকে যে লঙ্কা হিসাবে পরিচয় দিতে রাজী নয় তা'ও উল্লেখ করেছেন ; যদিও স্বামীজী সেখানে রামচন্দ্র ও তাঁর পূর্বপুরুষের কিছু পৌরাণিক নিদর্শন লক্ষ্য করেছেন। তার পর বিজয় সিংহের লঙ্কায় গমন এবং সেখানে আতিথ্য গ্রহণ ও বিশ্বাসঘাতকতার কথা বর্ণনা করে সিংহলে অশোকের প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও বর্তমানে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের প্রাধান্য প্রভৃতি বহু তথ্য দিয়েছেন। এই বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের ধর্ম-বিরোধী কার্যকলাপের কয়েকটি ঘটনাকে তিনি বেশ সরসভাবে তুলে ধরেছেন এবং প্রসঙ্গতঃ অন্যান্য দেশের বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সিংহল-বাসীদের বৌদ্ধধর্মের পার্থক্যও স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। সিংহলের প্রাচীন অবস্থা থেকে বর্তমান পর্যন্ত—এই সুবিস্তৃত ইতিহাস খুব সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হলেও পূর্ণাঙ্গতার আস্বাদ এনে দেয়।

এডেনের পরিচয় দিতে গিয়ে বিবেকানন্দ বলেছেন যে, এর প্রধান পরিচয় বন্দর হিসাবে হলেও বর্তমানে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলরূপে ইউরোপীয় দেশগুলির কাছে বিবেচিত হচ্ছে। প্রাচীন ইতিহাস প্রসঙ্গ বর্ণনায় আরবদের হাতে রোমানবাদ্‌সা প্রেরিত খ্রীস্টধর্ম প্রচারকের হত্যা এবং উপযুক্ত শাস্তিবিধানের জন্য হাব্‌সি রাজার কাছে রোমানবাদ্‌সার অনুরোধ এবং ক্রমান্বয়ে আরবের উপর ইরাণ, পর্তুগীজ, তুরস্কের আধিপত্য ও পুনরায় আরবের স্বাধীনতা-অর্জন প্রভৃতি বহু ঐতিহাসিক পট-পরিবর্তনের ঘটনা বিবৃত হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে ইংরেজের এডেন ক্রয় করা এবং ইউরোপের প্রায় সকল দেশের যুদ্ধ জাহাজের রসদ সংগ্রহের জন্য এডেনকে ও রেড-সি'র উপকূলবর্তী অঞ্চলকে ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করা প্রভৃতি নানা তথ্য দিয়েছেন।

মিসর, আরব ও সুয়েজের বর্ণনায়, মিসর প্রসঙ্গে প্রথমেই বলেছেন, এ দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, চিকিৎসাবিদ্যা, দর্শন ও স্থাপত্যচর্চার প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা এবং মিসরি সভ্যতার বিস্তারে দক্ষিণ ভারতীয় তামিলদের ভূমিকাও উল্লেখ করেছেন। মিসরের বাদ্‌সাদের পিরামিড রচনার পশ্চাতে বিভিন্ন সংস্কারের কথা বলে এর সঙ্গে আরবের চিকিৎসায় 'মামিয়া' নামে ঔষধের সংযোগটিও বর্ণনা করেছেন। মৌর্যসম্রাট অশোকের প্রচেষ্টায় মিসরে বৌদ্ধ-ধর্মের প্রসার ও থেরাপিউট্, অস্‌সিনি, গানিকি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উদ্ভব এবং তাদের ভিতর থেকে খ্রীস্টধর্মের উদ্ভবের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। বিভিন্ন বিদ্যাচর্চা ও বিদ্বজ্জনের সমাবেশে একদিন যে আলকসন্দ্রিয়া নগরী গৌরবজনক পরিচয় লাভ করেছিল খ্রীস্ট-ধর্মের গোঁড়ামিতে কি ভাবে তা' ধ্বংস হল তা'ও বর্ণনা করেছেন। মরুময় আরবদেশের বলশালী আরবদের দৈহিক গঠনের মুগ্ধ প্রশংসা করেছেন স্বামীজী এবং খ্রীস্টানদের ধর্মীয় গোঁড়ামি ও জাঠদের বর্বরতায় প্রাচীন ইউনান ও রোমানসভ্যতা নির্বাপিত হলে পৃথিবীব্যাপী

আধিপত্য বিস্তারের দুর্বার শপথ নিয়ে এই আরবরা একদিন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে বলে তিনি জানান। সুয়েজ প্রসঙ্গে, এই জল-পথের সৃষ্টির ইতিবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করেছেন এবং ভারতবর্ষের পণ্য এই জলপথের দ্বারা বাহিত হয়ে কি ভাবে বহির্বিশ্বের সমৃদ্ধি রচনায় সহায়তা করেছে সেই তথ্য পরিবেশনেই তিনি অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। বহু প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষের সঙ্গে জলপথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য বিদেশীদের তৎপরতার কথাও জানিয়েছেন।

ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশগুলির রাজতন্ত্রের উত্থান-পতন, সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ ও বিলুপ্তি, ধর্মবিস্তারের প্রতিযোগিতা গভীর মননশীলতা ও ঐতিহাসিক নিষ্ঠার সঙ্গে স্বল্পপরিসরে বর্ণনা করেছেন। গথ, ভ্যাণ্ডাল প্রভৃতি বর্বরদের দ্বারা রোমানসাম্রাজ্য আক্রমণ থেকে কনস্টান্টিনোপলের পতন পর্যন্ত ইউরোপীয় ইতিহাসের মধ্যযুগ এবং পরবর্তীকালে সভ্যতা-সংস্কৃতির পুনরভ্যুত্থান এবং তার প্রভাবে ইউরোপের উন্নতি ও আধুনিক যুগের সূচনা পর্যন্ত আলোচিত হয়েছে। প্রাচীন মিসর, ফিনিসিয়া, ফিলিস্টিন, বাবিল, আসীর, ইরাণী সভ্যতার সংমিশ্রণে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী ভূভাগের এই সভ্যতার উদ্ভব হলেও গ্রীকজাতির ভূমিকা যে সর্বাধিক তা' স্পষ্ট করে জানিয়েছেন। আবার জাতিতত্ত্বের দিক্ থেকে দেখিয়েছেন যে, সেমিটিক জাতিবর্গ ও ইরাণী, যবন, রোমক প্রভৃতি আর্যজাতির সংমিশ্রণে গঠিত জনসমাজের মিলিত উদ্যোগে এই সুপ্রাচীন সভ্যতার উদ্ভব। ইউরোপে আধুনিক সভ্যতার বিস্তারের ইতিহাস প্রসঙ্গে বলেছেন যে, তুর্কী মুসলমান-নেতা ওসমানের দ্বারা কনস্টান্টিনোপল আক্রান্ত হলে গ্রীক-পণ্ডিত-মণ্ডলী তাদের পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত জ্ঞান-ভাণ্ডার নিয়ে প্রাণভয়ে পশ্চিম ইউরোপের দিকে পলায়ন করে এবং সেই সূত্রে ইংরেজ, জার্মান, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশবাসীর মধ্যে আধুনিক সভ্যতা বিস্তার

লাভ করে। গ্রীকসভ্যতাকে খ্রীষ্টানদের সভ্যতার পূর্ববর্তীই কেবল বলেননি বরং এই সভ্যতা খ্রীষ্টানদের সংস্পর্শে বহুলাংশে নষ্ট হয়েছে বলে স্বামীজী জানিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন মিসরের পুরাণ-কথা, জাতি পরিচয়, 'আল্লা' শব্দের উদ্ভব, খ্রীষ্টধর্মের উৎপত্তি ও য়াহুদি জাতির পরিচয়দান সূত্রে তিনি বহু অজ্ঞাত তথ্য সাধারণের বোধগম্য করে পরিবেশন করেছেন।

ইউরোপের ঐতিহ্যমণ্ডিত দেশ ফ্রান্স ও ফ্রান্সের অনুকরণে নবগঠিত জার্মান দেশের আলোচনায় তুলনামূলক পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন। ফরাসী সভ্যতার মহাকেন্দ্র প্যারিসকে অপূর্ব কাব্যকথার আশ্রয়ে বর্ণনা করেছেন। জার্মান প্রসঙ্গে যেমন প্যারিসের স্থূল অনুকরণের কথা বলেছেন তেমনি অধ্যবসায় ও কর্মশক্তিতে নব-জাগ্রত জার্মানের গৌরবের কথাও আলোচনা করেছেন।

অস্ট্রিয়ার পূর্বগৌরব ও তার বর্তমান হতমান অবস্থা, প্রুশিয়ার অগ্রগতি, ইতালির অভ্যুত্থান ও আসন্ন পতনের সম্ভাব্য কারণগুলি যথেষ্ট ঐতিহাসিক বিজ্ঞতার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গতঃ অস্ট্রিয়ার পারিবারিক মর্যাদার অংশীদার হবার জন্য নেপোলিয়ানের অস্ট্রিয় রাজপরিবারের কন্যাকে বিবাহ ও তার করুণ পরিণতির কথা বিবৃত করেছেন। ইতালীর অভ্যুত্থানে অস্ট্রিয় রাজপরিবারের ধর্মগুরু পোপের শোচনীয় পরিণতির দিক্‌টি যেমন তুলে ধরেছেন তেমনি ইংল্যাণ্ডের কুপরামর্শে ইতালীর সৈন্যবৃদ্ধি, রণপোত সংগ্রহ ও আফ্রিকার সাম্রাজ্যবিস্তারের প্রচেষ্টা তার আসন্ন ধ্বংসের কারণ বলে স্বামীজী উল্লেখ করেছেন। অস্ট্রিয়া-শাসিত হুঙ্গারির অধিবাসীরা তুর্ক বংশোদ্ভূত বলে এদের চরিত্রে যুদ্ধপ্রিয়তা এসেছে বলে তিনি জানিয়েছেন এবং সেই কারণে অস্ট্রিয়ার কবলমুক্তির জন্য এরা ক্রমাগত সংগ্রাম করে চলেছে। সমগ্র ইউরোপে সংস্কৃত সমধর্মী ভাষা-বিরোধী ইন্দো-ইউরোপিয়ানগোষ্ঠীর বাইরে যে অল্প কয়েকটি জাতি আছে হুঙ্গারিয়া তার অন্যতম।

তুরস্ক সম্পর্কে স্বামীজী প্রদত্ত বিবৃতিটি একটু দীর্ঘ। এই তুরস্ক জাতির প্রাচীন বাসস্থান 'চাগওই' হিমালয় ও হিন্দুকুশ পর্বতের উত্তরে অবস্থিত ছিল। দিল্লীর মোগলবাদসাহ বংশ, পারস্য রাজবংশ, কনস্টান্টিনোপল-অধিপতি ও হুঙ্গারিয়ান জাতি এই চাগওই তুর্কী-বংশোদ্ভূত। প্রাচীন তুর্কীরা যাযাবর শ্রেণীর ছিল এবং এদের অনেকে এখনও মধ্য এশিয়ার কোন কোন অঞ্চলে অনুরূপ জীবনযাপন করে। এরা পূর্বে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিল এবং পরবর্তী কালে মুসলমানধর্ম গ্রহণ করে। আফগান, গান্ধার প্রভৃতি দেশে এদের বৌদ্ধধর্মালম্বী পূর্বপুরুষেরা অপূর্ব স্থাপত্য-কীর্তি মঠ, মন্দির, স্তূপ নির্মাণের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা করে; পরবর্তীকালে মুসলমানধর্মাবলম্বী উত্তরপুরুষেরা এগুলিকে কেবল ধ্বংসই করেনি, বরং এই সব কীর্তি মনুষ্যসৃষ্টি বলে অস্বীকার করে। তুর্কীদের বর্বর আক্রমণে কনস্টান্টিনোপলের পতনের মধ্য দিয়ে এদের মানসিক সংকীর্ণতার নগ্ন পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তুর্কীজাতির প্রাচীন ধর্মীয় বিশ্বাস প্রসঙ্গে বলেছেন, এরা সর্প পূজায় বিশ্বাসী ছিল।

পরিশিষ্ট অংশে কনস্টান্টিনোপল ও এথেন্সের আধুনিক পরিচয় তুলে ধরেছেন এবং প্যারির লুভার মিউজিয়মের বর্ণনায় প্রাচীন গ্রীকশিল্পের একটি ধারাবাহিক ঐতিহাসিক বিবর্তনের পরিচয় দিয়েছেন। গ্রীকশিল্পের ইতিহাস-বর্ণনায় বিবেকানন্দ দক্ষ চিত্র-সমালোচকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

উত্থান-পতনের বন্ধুর পথ দিয়ে বিশ্ব-ইতিহাসের যে রথচক্র আবর্তিত হয়েছে প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত তার বিস্তারিত খুঁটিনাটি বর্ণনায় বিবেকানন্দ তাঁর গ্রন্থকে অযথা ভারাক্রান্ত করে তোলেননি; অথচ বিষয় ও তথ্য -নির্বাচনে এত গভীর বিচক্ষণতা অবলম্বন করেছিলেন যে, নির্বাচিত তথ্যই সমগ্রতার স্বাদ এনে দিয়েছে। আবার এই ইতিহাস-বর্ণনায় বহির্বিশ্বের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে ভারতবর্ষ কিভাবে পুষ্ট করেছে তারও ইতিহাস-

সমর্থিত বহু সংবাদ তিনি একান্ত প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখেই বর্ণনা করেছেন। তাঁর স্বদেশ ও স্বজাতি সম্পর্কে গভীর মমত্বের এ একটি বিশিষ্ট পরিচয়। তাই বলা অন্যায় হবে না যে, বিশ্ব-ইতিহাস পর্যালোচনার সমসূত্রে তাঁর স্বদেশপ্রীতিও সমন্বিত হয়েছে। ইতি-হাসের আলো ফেলে তিনি অতীতকেই কেবল অনুসন্ধান করেননি, সেই সঙ্গে বর্তমানের বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য পরিণতিকেও নির্দেশ করেছেন।